আন্না

– জসীম উদ্দিন

ভদ্রলোক আমার সার্টিফিকেটগুলো উল্টে-পাল্টে দেখলেন। তার চেহারা গম্ভীর দেখে আমার মনটা বিষাদে ছেয়ে গেল। আঙুলের ইশারায় চেয়ার দেখিয়ে বসতে বললেন। কিছুটা ইতস্তত করে সেটায় বসে পড়লাম। অজানা আশংকায় পা দুটো কাপছে। বুকে যেন হাতুড়ি পেটা হচ্ছে। গলাটা অনেক আগেই শুকিয়ে গেছে।

টু মাচ কোয়ালিফিকেশন – বিড় বিড় করে বলে আমাকে চোখ তুলে দেখে নিলেন। ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে বললেন, আমাদের অফিসে একজন রিসেপশনিস্ট-কাম-অফিস অ্যাসিস্টান্ট-এর প্রয়োজন। তুমি কি এ ধরনের একটা পদে কাজ করবে?

আমি শুকনো গলায় বললাম, হ্যা।

কেননা তখন আমার একটা চাকরির বড়ই প্রয়োজন। তেল সম্পদের প্রাচুর্যে ভরা মধ্যপ্রাচ্যের এ দেশটিতে এসে আমি এখন বেকার। নয় ভাইবোনের বৃহৎ সংসারে আমি উপার্জনের অন্যতম ভরসা। বাবা বৃদ্ধ হয়ে গেছেন। মা সারা বছর রোগাক্রান্ত থাকেন। ঘরে দুই-দুটো বোন বিয়ের উপযুক্ত। ছোট দুটো ভাই ও একটি বোন কলেজে এবং স্কুলে পড়াশোনা করছে। বড় ভাইটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে যা বেতন পান তাতে *নুন আনতে পানতা ফুরোয়।* তাই বাংলাদেশে স্বল্প বেতনের শিক্ষকতা পেশাটি ছেড়ে দিয়ে কাড়ি কাড়ি টাকা রোজগার করতে এ দেশটিতে আমার আগমন। অথচ গত আটটি মাস এখানে আমি বেকার। পরিচিত লোকদের সহায়তায় প্রতিনিয়ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাকরির জন্য ধরনা দিয়েছি। এখানে টেকনিকাল শিক্ষা ও বাস্তব অভিজ্ঞতা ছাড়া প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার কোনো মূল্য নেই। বাংলাদেশের মতো এখানেও চাকরির আকাল। এ অবস্থায় যে কোনো একটা চাকরি হলেই আমার চলবে।

কিন্তু তোমাকে এক হাজার দিরহাম-এর বেশি বেতন দিতে পারবো না।

ভদ্রলোকের কথায় আমার ভাবনায় ছেদ পড়লো। আমি খুশি মনে রাজি হয়ে গেলাম।

তোমাকে সকাল সাতটা থেকে দুপুরে দেড়টা পর্যন্ত ডিউটি দিতে হবে। এক মিনিটও দেরি করলে চলবে না।

জি হ্যা, উত্তর দিলাম।

তোমার ঘর কোথায়? মানে রুম। তিনি এবারই প্রথম আরবি ভাষায় জিজ্ঞাসা করলেন।

আমার থাকার কোনো রুম নেই।

বলো কি! তাহলে কোথায় ঘুমাও, কোথায় খাও?

বন্ধু-বান্ধবদের বাসায় যাই, ঘুমাই।

এ দেশে এসেছ কতোদিন হলো?

তোমাদের দেশে এসেছি আজ আট মাস হতে চললো। এতোদিন কোনো চাকরি পাইনি। বন্ধু-বান্ধবদের ঘাড়ে এক রকম বোঝা হয়েই দিন যাপন করছি।

ওহ, সরি! তুমি চাইলে আমার বাসায় থাকতে পারো। অবশ্য তাতে যদি তোমার কোনো আপত্তি না থাকে।

ভদ্রলোকের কথায় আমি আর না বলতে পারলাম না। এর চেয়ে বড় পাওয়া আর কি হতে পারে!

সকালে আমার মেয়েকে স্কুলে নেয়ার পথে আমাদের ড্রাইভার তোমাকে অফিসের সামনে নামিয়ে দেবে। দুপুরে অবশ্য তুমিই ট্যাকসি নিয়ে বাসায় যাবে।
ভদ্রলোকের বদান্যতায় তাকে পা ধরে সালাম করতে ইচ্ছে হলো। কিন্তু সেটা আর হলো না। আরবরা সেটা পছন্দ করে না।
ভদ্রলোকের ইচ্ছায় সেদিনই যোগ দিয়েছিলাম কাজে। দুপুরে অফিসের কাজ শেষে নিজের নিত্যপরিধানের কাপড়-চোপড় সমৃদ্ধ ব্যাগটা নিয়ে ওনার গাড়িতে চড়েই রওনা হলাম বাসার উদ্দেশ্যে। মরুভূমির অচেনা পথে গাড়ি দ্রুত বেগে ছুটে চলছে। বাইরে গরম হাওয়া। অথচ গাড়ির ভেতরে এসি চালু থাকায় হিম শীতল পরিবেশ। তিনি চুপচাপ গাড়ি চালাচ্ছেন। তার নীরবতা দেখে মনে হলো, তিনি হয়তো বেশি কথা বলা পছন্দ করেন না। শুনেছি তিনি এক সময় নাকি আর্মির বৃগেডিয়ার ছিলেন।
কয়েক বছর আগে অবসর নিয়েছেন। আর্মি অফিসাররা আমাদের দেশেও সাধারণ লোকের সঙ্গে কম কথা বলেন। তিনিও হয়তো সে রকম।
বাংলাদেশে তুমি কি কাজ করতে? তিনি নীরবতা ভাঙলেন।
একটা বেসরকারি গার্লস হাই স্কুলে শিক্ষকতা করতাম।
মেয়েদের স্কুলে তুমি পুরুষ হয়ে শিক্ষকতা করতে?
হ্যা, আমাদের দেশে সেটা প্রচলন আছে।
এমন ভালো একটা পেশা ছেড়ে কেন চলে এলে?
আমাদের দেশে এ পেশার লোকদের বেতন খুবই কম। সংসার চলে না ঠিকমতো।
কতো টাকা আনুমানিক?
এই দেশের হিসাবে আনুমানিক দুই থেকে তিনশ দিরহাম।
সেখানে এ ছাড়া ভালো বেতনের আর কোনো চাকরি পাওয়া যায় না?
না। আমাদের দেশে প্রতি বছর যে হারে ছেলেমেয়েরা শিক্ষা শেষ করে বের হচ্ছে সে হারে চাকরির পদ সৃষ্টি হচ্ছে না।
ও হ্যা, তুমি কোন বিষয়ে পড়াতে?
ইংরেজি।
আমার মেয়ে আন্না ইংরেজিতে একদম কাচা। তুমি কি তাকে সাহায্য করতে পারবে?
অফ কোর্স। কোন ক্লাসে পড়ে সে?
ক্লাস নাইনে। তুমি বিকেলে এ কাজটি স্বচ্ছন্দে করতে পারো। আর এ জন্য তোমাকে পাচশ টাকা প্রতিমাসে অতিরিক্ত দেবো। অবশ্য তোমাকে সপ্তাহে পাচ দিনই মাত্র পড়াতে হবে।
গাড়ি কখন যে তার আলিশান দোতলা বাড়ির সামনে এসে দাড়িয়েছে টেরই পাইনি।

মনে হচ্ছে এ রুমটায় আমার থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ভেতরবাড়ি থেকে ইংরেজি এল অক্ষরের ডিজাইনে বাড়ির এ অংশটি একতলা হয়ে সোজা পূর্বদিকে চলে গেছে। বর্ধিত এ একতলা অংশটিতে পাচটি রুম। প্রথম রুমটায় আমি। এসির ঠাণ্ডা হাওয়া এবং মনোরম পরিবেশে প্রাণ জুড়িয়ে যায়। একজন ফিলিপিনো আয়া দরজা খুলে আমাকে ডাকলো। আমি তার পিছু পিছু অন্দর মহলে গেলাম।

মি. হামদান সহাস্যে আমাকে ভেতরে ডাকলেন। আমি প্রশস্ত সোফায় তার মুখোমুখি বসলাম। সামনে টি-টেবিলে বড় একটা প্লেটে হরেক রকমের ফল। কৌটা ভর্তি ফলের জুস। এক পাশে রয়েছে চা ও কফি।

তিনি বললেন, নাও, খাও।

আমি দুয়েকটা আঙুর মুখে দিয়ে এক কৌটা জুস খেলাম। আরবদের আতিথেয়তার কথা অনেক বইতে পড়েছি। এবার স্বচোখে দেখলাম।

হামদান তার মেয়ে আন্না্র সঙ্গে আমায় পরিচয় করিয়ে দিলেন। আন্নাকে বললেন, ইনি তোমার ইংরেজির শিক্ষক।

মেয়েটির দিকে তাকালাম।

মেয়েটি মুচকি হেসে আমাকে সালাম করলো।

আমিও জবাব দিলাম, ওয়াআলাইকুম সালাম।

এবার মেয়েটি আমাকে তার পড়ার রুমে নিয়ে গেল। সেখানে বসেছিল আরো একটা মেয়ে। আমার আগমনে সে স্মিত হেসে চলে গেল। আন্না আর আমি মুখোমুখি বসলাম। পাঠের আগে আবরদের চিরাচরিত নিয়মে সে বললো, কেইপ হাল ইনতে, তুমি কেমন আছো?

আলহামদুল্লিাহ, খায়ের – স্রষ্টার ইচ্ছায় ভালো।

সু আখবার, তামাম – কি খবর, ভালো তো?

আইওয়া, তামাম – হ্যা ভালো।

সু এসমুক ইনতে – তোমার নামটা কি?

জসীম উদ্দিন – আমার নাম জসীম উদ্দিন।

জাসীম আদদীন? হ্যালো এছমায় – জসমি উদ্দিন? সুন্দর নামতো! আনা আন্না – আর আমি হচ্ছি আন্না। আর এ চেয়ারটি ছেড়ে কিছুক্ষণ আগে যে মেয়েটি চলে গেল সে হচ্ছে আমার বড় বোন। তার নাম সাম্মা। ইউনিভার্সিটি পাস করে একটা ব্যাংকে চাকরি নিয়েছে। আমার আরো দুই বোন আছে। নোরা ও সারা। তারা ইউনিভার্সিটিতেই পড়ে। প্রতি বৃহস্পতিবার তারা হস্টেল থেকে বাড়ি আসে। দুই দিন থেকে আবার চলে যায়। আর একমাত্র ছোট বোনটির নাম রিম। সে নার্সারিতে পড়ে।

কথাগুলো বলে আন্না পাঠে মনোনিবেশ করলো।

আমি গত দুই বছরে আন্নাদের পরিবারের একজন সদস্যের মতো হয়ে উঠেছি। আমার ভিসাটাও আন্নার বাবা স্পন্সরশিপ বদলিয়ে নিজের কম্পানিতে লাগিয়েছেন। এ দুই বছরে আন্না অনেক বেড়ে উঠেছে। এমনিতেই আবরদের বাড়ন্ত শরীর। এগারো বারো বছরের মেয়েদের যৌবন বাংলাদেশের ষোড়শী যুবতীদেরও হার মানায়। আর আন্না তো এখন বোধহয় পনেরো ষোল বছরের যুবতী। তার দেহে এখন পরিপূর্ণ যৌবনের প্রকাশ। দৈহিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আন্নার চাল-চলনেও ইদানীং কিছুটা পরিবর্তন লক্ষ্য করছি। যেমন গত কয়েক মাস ধরে আন্না পড়ার সময় মুখে নেকাব পারে না। আমার আগমনে সে হাত বাড়িয়ে দেয় হ্যান্ডশেক করতে। আবার যাওয়ার সময়ও অনুরূপ। গত মাসে সে আমাকে দুই জোড়া প্যান্ট ও শার্ট পিস গিফট গিয়েছে,

সে সঙ্গে সেলাইয়ের টাকাও। এক শুক্রবারে সে শপিং করতে গিয়ে আমার জন্য একটা ঔলথম ঈম্ম পারফিউম কিনে এনেছিল।

নিতে চাইনি, বলেছিলাম, আমার কাছে ৃভণ ুটভ ওদমষ একটা আছে।

সে বললো, ওটা দুর্গন্ধ। এটাই প্রতিদিন ব্যবহার করবে।

আজ শুক্রবার। বৃহস্পতিবার ও শুক্রবারে আন্নাকে পড়াই না। বৃহস্পতিবার বিকেলে ওরা পাচ বোন রুটিন মাফিক পার্লারে যায়। সেখানে হেয়ার ড্রেসিং, ম্যানিকিউর শেষ করে হাতে ও পায়ে মেহেদি লাগায়। শুক্রবারে যায় শপিং করতে। আমিও এ অবসরে আজ কিছু কেনা-কাটা করলাম। দেশে নিজ ভাইবোনদের জন্য। আর কয়েকদিন পরে দেশে যাবো। নিজাম, সাইফুল, পারভীন, জলি, কলি ও মা-বাবা আমার জন্য অপেক্ষায় আছে। ঈদ উপলক্ষে তাদের সঙ্গে আনন্দ করবো।

আন্নার বাবা বলেছেন, ঈদের দুই দিন আগে আমার জন্য প্লেনের টিকেট কিনে দেবেন। রমজানের ঈদ ও কোরবানির ঈদ দুটোই দেশে উদযাপন করে ফিরে আসবো।

আন্না অবশ্য আমার বাড়ি যাওয়ার কথা শুনে খুশি হয়নি। সে চায়, ঈদের সপ্তাহ খানেক পরে যেন আমি যাই। ঈদের ছুটিতে আমাকে নিয়ে দুবাই ও শারজাহ থেকে সে বেড়িয়ে আসতে চায়। আন্নার মনোভাব আমার কাছে দুর্বোধ্য মনে হলো।

রাত বারোটা পেরিয়ে গেছে। ছাদে উঠে পায়চারি করছি। বিকেলে লম্বা একটা ঘুম দিয়েছিলাম। তাই ঘুম আসছে না। গত চার দিন আন্নাকে পড়ানো হয়নি। সে এখন অসুস্থ। হাসপাতালে আছে চার দিন যাবৎ। শুনেছি তার নাকি টাইফয়েড হয়েছে। আন্নার জন্য মনটা খারাপ হয়ে গেল। ছাদের ওপাশে ভেতর বাড়ির দিকে একটা ছায়ামূর্তি নড়ে উঠলো। ধীর পায়ে সেটা আমার দিকে এগিয়ে আসছে। চিনতে পারলাম, এটা আন্নার বড় বোন। সাম্মা আরো কাছে এসে আমার গা ঘেষে দাড়ালো। একটা চিরকুট আমার দিকে বাড়িয়ে দিতেই দূরে সরে গেলাম।

সে আবারও কাছে এসে বললো, নাও এটা। আমি লিখিনি। আন্না লিখেছে হাসপাতাল থেকে।

এবার সেটা হাতে নিলাম। ইংরেজিতে লেখা ছিল চিরকুটটি। সেখানেই সিগারেট লাইটার জ্বালিয়ে পড়ে নিলাম।

আন্না লিখেছে –

কতোদিন তোমাকে দেখি না। একটিবার হাসপাতালে আসবে কি? প্রাণভরে দেখে নেবো তোমাকে।

আন্না।

পড়া শেষ হতে না হতেই সাম্মা বললো, আন্না বোধহয় তোমাকে ভীষণ ভালোবাসে।

তার চোখের দিকে তাকালাম।

সে বললো, তুমিও কি আন্নাকে ভালোবাসো?

আমার নির্বাক চাহনি তার মুখ থেকে সরে এলো।

এবার আমার একটা হাত ধরে সে বললো, অবশ্য তুমি যদি চাও আমাকেও একান্তে পেতে পারো। আমি তো আন্নার চেয়ে কম সুন্দরী নই।

নো, নো, নেভার, ইমপসিবল। কথাগুলো বলে দ্রুত সিড়ি বেয়ে নিচে নেমে এলাম।

হাসপাতালের সাত নাম্বার ক্যাবিনের দরজা খুলে আন্নার বাবা ভেতরে গেলেন। আমিও তার পেছনে চললাম। মেয়ের শিয়রের পাশে বসে পড়লেন তিনি। আমি কিছুটা দূরে দাড়িয়েছি। মেয়ের হাত ধরে হামদান বললেন, চিন্তা করো না মা। তুমি এখন পুরোপুরি সুস্থ হতে চলেছো। আগামীকাল তোমাকে এখান থেকে রিলিজ করা হবে। ডাক্তার বলেছেন, বাড়ি গিয়ে সপ্তাহ খানেক বিশ্রাম নিলেই হবে।

আন্নাকে দেখে আমার ভীষণ মায়া হলো। এ কয়দিনে সে খুব শুকিয়ে গেছে। চেহারা হয়েছে ফ্যাকাশে। আন্না কতোক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে আছে খেয়াল করিনি। আমার চোখে চোখ পড়তেই তার চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। সে তার ঊর্ধাঙ্গ সোজা করে বসলো। বাবার অলক্ষ্যে আমাকে চোখের ইশরায় কাছে ডাকলো।

আমি সাড়া দিলাম না।

তড়িঘড়ি করে বাবাকে সে বললো, আমার জুস খেতে ইচ্ছে করছে।

এক্ষুণি এনে দিচ্ছি, বলে তার বাবা নিচে নেমে গেলেন।

ধীর পদে তার কাছে গিয়ে দাড়ালাম। কপালে হাত রেখে বললাম, জ্বর তো এখন তেমন একটা নেই। তুমি এখন পুরোপুরি সুস্থ হতে চলেছো। কালই তোমাকে বাসায় নিয়ে যাবে।

আন্নার ঠোঁট দুটো কাপছে। তার দুচোখ বেয়ে কয়েক ফোটা জল গড়িয়ে পড়লো। আমি হাতটা সরিয়ে নিতেই আন্না আমার হাতটা দুহাতে টেনে নিয়ে তার বুকে চেপে ধললো। আমার বাহুতে বিদ্যুৎ বেগে সে চুমু খেতে লাগলো। বললো, তোমাকে ছাড়া আমি বাচবো না। আমাকে তুমি এখান থেকে নিয়ে চলো।

পলকেই আন্নার বাবা জুস নিয়ে ভেতরে এলেন। অপ্রস্তুত আমি। নিজের হাতটা দ্রুত ছাড়িয়ে নিয়ে দূরে সরে দাড়ালাম। আন্নার বাবা দৃশ্যটা বোধহয় দেখেছেন, হয়তো দেখেননি। তার চেহারা দেখে সেটা বোঝা গেল না।

ঘড়িতে রাত দুটো বাজার সংকেত দিল। আগামীকাল সন্ধ্যা সাতটায় আমার ফ্লাইট। অনেক দিন পর বাড়ি যাচ্ছি। মা–বাবা, ভাইবোনদের দীর্ঘ দিন পর দেখবো। সে এক অব্যক্ত আনন্দ। এ আনন্দের মাঝেও মনে সামান্যতম স্বস্তি নেই। কিছুক্ষণ আগে আন্না সবার অগোচরে এখানে এসেছিল। হাসপাতাল থেকে ফিরে আসার পর তাকে আর পড়ানো হয়নি। আবেগ জড়িত কণ্ঠে তার বলা কথাগুলো হৃদয়ে তোলপাড় শুরু করে দিয়েছে। বার বার কানে বাজতে লাগলো –

জাসীম, তোমাকে ছাড়া আমার এ জীবন অর্থহীন। আমি এক মুহূর্তেও তোমাকে ছাড়া বাচবো না। যেভাবেই হোক আমাকে তোমার সঙ্গে নিয়ে চলো। আমাকে তুমি বাংলাদেশে নিয়ে চলো।

এখন বোধহয় সকাল হয়েছে। কয়টা বাজে জানি না। আমার হাত–পা শিকলবন্দী। কনডেমড সেলে একাকী মৃত্যুর প্রহর গুণছি। আর কয়েক ঘণ্টা পর আমাকে এ পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হবে।

দুইজন পুলিশ দরজা খুলে ভেতরে এলো। তাদের একজন বললো, আজ তোমার কি কি খেতে ইচ্ছে করছে?

বললাম, কিছুই না।

তোমার শেষ ইচ্ছাটা কি?

আমি নির্বাক।

নিঃসংকোচে বলো। আমাদের সরকার তোমার শেষ চাওয়াটা পূরণ করবে।

বললাম, আজকের নিউজপেপারটা একটু পড়তে দেবেন কি?

কিছুক্ষণ পরে তাদের একজন আজকের কতোগুলো সংবাদপত্র এনে আমার সামনে দিল। দিটফণণন কধবণ্র, ঐলফত ৃণষ্র, ইপদঠটর দিটফণণন প্রত্যেকটি সংবাদপত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় আমার এবং আন্নার ছবি পাশাপাশি বড় করে ছাপা হয়েছে। হেডলাইনে বড় বড় অক্ষরে লেখা –

আজ বাংলাদেশি এক যুবকের ফাসি। সংযুক্ত আরব আমিরাতের নাগরিক অবসরপ্রাপ্ত বৃগেডিয়ার হামদান–এর কন্যা আন্নাকে বাংলাদেশি যুবক জসীম উদ্দিন সঙ্গে নিয়ে পালিয়ে নিজ দেশে যাওয়ার পথে আবু ধাবি এয়ারপোর্টে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে। আদালত বাংলাদেশি যুবককে ফাসিতে ঝুলিয়ে মৃত্যুদণ্ডের রায় দিয়েছে। সে সঙ্গে আন্নাকে তার বাবার হেফাজতে ছেড়ে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছে। আজ বিকেল তিনটায় সে যুবকের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হবে।

হঠাৎ কলিংবেলের শব্দে দুঃস্বপ্নটা ভেঙে গেল। হৃদপিণ্ডটা ধুক ধুক করছে অবিরত। ভীরু পদে এগিয়ে গিয়ে এক গ্লাস ঠাণ্ডা পানি খেলাম।

দরজা খুলতেই ফিলিপিনো আয়াটি বললো, আজ তোমার না বাড়ি যাওয়ার কথা? কাপড়–চোপড় গুছিয়ে তৈরি হচ্ছো না কেন? স্পন্সর কিছুক্ষণ পরেই তোমার পাসপোর্ট টিকেট নিয়ে ফিরে আসবেন।

সকাল থেকে আর আন্নাকে দেখার চেষ্টা করিনি। দুঃস্বপ্নটা বার বার আন্না আর আমার মাঝে প্রাচীর হয়ে দাড়িয়েছে।

আমাদের বাহন মার্সিডিজটা আবু ধাবি এয়ারপোর্টের দিকে দ্রুত বেগে এগিয়ে চলেছে। হামদান সামনে ড্রাইভারের সঙ্গেই বসেছেন। পেছনে আমি একা। বুটের ভেতর আমার কাপড়–চোপড় আর লাগেজ। যাত্রাপথে কেউ কোনো কথা বলছি না। হঠাৎ এ ব্যতিক্রমটা লক্ষ্য করলাম। উপযাচক হয়ে কোনো কথা বলার স্পৃহা আমারও নেই। পার্কিংয়ে গাড়িটা রেখে মালপত্র বুকিংয়ে দিলাম। ইমিগ্রেশনে যাওয়ার আগে আন্নার বাবা আমার পাসপোর্ট ও টিকেট হাতে দিলেন, সে সঙ্গে আরো একটি কাগজ।

সেটি আর কিছু নয়, আমার ভিসা ক্যানসেলেশন ফরম।

আমার চোখ কাগজটির ওপর স্থির হয়ে আটকে গেল। মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়লো। মনে হলো পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাচ্ছে।

আমাকে কিছুই বললেন না হামদান। শুধু ড্রাইভারকে বললেন, তিনি চলে যাচ্ছেন। সে যেন ভিসা ক্যানসেলেশন ফরমটি ইমিগ্রেশন অফিসের আনুষঙ্গিকতা সেরে বাসায় ফেরত নিয়ে যায়।

ইমিগ্রেশন শেষ করে অপেক্ষমান যাত্রীদের সঙ্গে বসে আছি। নীরব–নিথর আমি। কাচের দেয়াল ভেদ করে দূর দিগন্তে দৃষ্টি চলে গেছে। একটি মেয়ে ঝড়ের বেগে এদিকে ছুটে আসছে। ভেতরে আসতে চাইলে গেটে সিকিউরিটি বাধা দেয় তাকে। অগত্যা সে কাচের দেয়ালের ওপাশেই

দাড়ালো। তার সন্ধানী চোখ দুটো কাকে যেন খুজছে। কিন্তু তাকে দেখে মনে হলো, অনেক দিনের চেনা। আর সে ডাকছেই বা কাকে?

আমাকে?

কিছুটা এগিয়ে গেলাম তার দিকে। একি! আন্না!

নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছি না। আরো কাছে গেলাম তার দিকে। একি! তার দুই গাল বেয়ে অশ্রু ঝরছে। আকুলভাবে আন্না কি বলছে? আমি কিছুই শুনতে পাচ্ছি না। আন্না ও আমি কতো কাছে। অথচ তার কথা আমি মোটেই শুনতে পাচ্ছি না। আমার বুকের ভেতরটা ভেঙে যায়।

নিষ্ঠুর কাচের দেয়াল ভেদ করে আন্নার বুকফাটা আর্তনাদ আমি শুনতে পাই না।

আল-আইন, ইউএই থেকে

ঈদের দশটি অর্থ

– নূরে আলম

ঈদ মানে

এক. প্রিয়জনের মধুর সান্নিধ্য।

দুই. জ্যামবিহীন রাস্তায় দ্রুত গন্তব্যে পৌছা।

তিন. বসের কাছ থেকে কাজে সহযোগিতা পাওয়া।

চার. জিনিস কিনতে গিয়ে ঠকে না যাওয়া।

পাচ. খোজাখুজির সময় জিনিস যথাস্থানে পাওয়া।

ছয়. অবসরে বই পড়া।

সাত. নির্মল প্রকৃতি থেকে বুক ভরে শ্বাস নিতে পারা।

আট. উপর থেকে পতিত দ্রব্য গায়ে না পড়া।

নয়. প্রয়োজনের মুহূর্তে বিদ্যুৎ চলে না যাওয়া।

দশ. যায়যায়দিনের বিশেষ সংখ্যা হাতে পাওয়া।

সেই সঙ্গে সেটাতে নিজের লেখা প্রকাশিত হলে আনন্দ দ্বিগুণ।

ঢাকা থেকে

অনাগত

– উম্মে কুলছুম মুন্নি

রাগটা আমার স্বামীর ওপর। তার ব্যবসা ছাড়া সে অন্য কিছুই বুঝতে চায় না কিংবা বোঝে না। বৈষয়িক ভাবনা ছাড়া অন্য সব কিছুই তার কাছে যেন মূল্যহীন।

অগত্যা একা একাই স্বপ্ন গড়ি ও স্বপ্ন ভাঙি। মনে মনে রোমান্টিকতার সাগরে ভেসে যাই আবার ফিরে আসি। চোখ বন্ধ করে দূরে কোথাও হারিয়ে যাই। একা একা ঘুরে বেড়াই অজানায়। আকাশ নীলিমায় ভেসে বেড়াই। আর অতল সাগরের শীতল স্পর্শ অনুভব করি।

আমার এসব উপলব্ধি তাকে ছুতে পারে না বিন্দুমাত্র। যন্ত্রের মতোই তার চলাফেরা। তাই তার নাম রেখেছি *রোবট মানুষ।* বিয়ে হয়েছে বেশি দিন হয়নি। এ কয়টা বছর মানুষের হেসে–খেলেই কেটে যায় স্বামীর সঙ্গে। আমার তো আর সে উপায় নেই। তাই মাতৃত্বের ব্যাকুলতা পেয়ে বসলো আমায়।

বরাবরের মতো রোবট মানুষটির এতেও কোনো সাড়া নেই। কিন্তু বিধাতা সদয় হলেন। আমি মা হতে চলেছি। কি যে আনন্দ হচ্ছে আমার। সে আনন্দ একা একা উপভোগ করতে কষ্ট হচ্ছিল আমার। খুব কাছের কারো সঙ্গে শেয়ার করতে ইচ্ছা হচ্ছিল। তাই কলম ধরেছি।

আমি এখন আর একা নই। ইচ্ছা করছে দুই হাত প্রসারিত করে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে বলি, তোমরা সবাই কি শুনতে পাচ্ছো, আমি মা হতে চলেছি। এতো সুখ, এতো আনন্দ কোথায় যে রাখি!

এ এক অন্য রকম ভালোলাগা। নতুন মা হওয়ার আবেশে আমি রোমাঞ্চিত, আমি শিহরিত, আমি পুলকিত। এই অর্জন, এই সাফল্য, এই ভালোলাগার অনুভূতি পৃথিবীর কোনো ভাষাতেই প্রকাশ করা সম্ভব না।

অনেকের কাছে শুনেছি, প্রথম মা হওয়া ভীষণ কষ্টের। আসলেই তাই। উফ! কতো যে সমস্যা হচ্ছে। কিন্তু আমি মোটেও ক্লান্ত হয়নি। এ কষ্টগুলোই আমাকে ভালোলাগার মুগ্ধ পরশ বুলিয়ে দেয়। আরো বেশি বেশি অনুভব করি আমার মাতৃত্বকে।

ও ভালো কথা, রোবট মানুষটিও খানিকটা বদলেছে। আমাকে প্রচুর সময় দিচ্ছে। আসতে যেতে নজর দিচ্ছে আমার প্রতি।

সময় মতো খেয়েছো তো? বেশি নড়াচড়া করো না। ওষুধ সময় মতো খেয়ে নাও। কোনো দুষ্টুমি করো না। জলদি জলদি ঘুমিয়ে পড়ো।

আর পেটে কান পেতে শুনতে চেষ্টা করে হৃদস্পন্দন। কি যে ভালো লাগছে আমার। সারাক্ষণই বিভোর থাকি স্বপ্নের এক আবেশে। মনে হয়, আমার চারপাশে জ্বল জ্বল করছে মুঠো মুঠো সোনা রোদ্দুর।

শরীরটা বেঢপ আকার ধারণ করেছে। নড়াচড়ায় ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। ডেলিভারি ডেট পড়েছে ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে। হয়তো ঈদের আগে অথবা ঈদের পরে কিংবা ঈদের দিনই আমি মা হবো। আর যদি তাই হয় তাহলে তো এই ঈদ হবে আমার কাছে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ঈদ। ডাক্তার বলেছে প্রসবকালে কিছু জটিলতা দেখা দেবে আমার। ব্লাড গ্রুপ নেগেটিভ, তাই। আমার এন্টিবডির সঙ্গে বাচ্চার এন্টিবডি কিছুতেই যদি না মেলে তাহলে বাচ্চা জন্মের পর পরই তার নাভি থেকে রক্ত নিয়ে একটা ইনজেকশন দিতে হবে থাকে। না হলে পরবর্তী কালে সন্তান নিতে গেলে মায়ের মৃত্যু অনিবার্য। এবং সদা দুই ব্যাগ রক্ত প্রস্তুত রাখতে বলেছেন ডাক্তার।

এই নিয়ে সবাই ভীষণ চিন্তিত। হন্যে হয়ে ডোনার খুজছে সবাই। আমি আবার এতে শর্ত জুড়ে দিয়েছি। অবশ্যই ডোনাররা ড্রাগ এডিক্টেড কি না এবং এইডস ও হেপাটাইটিসে আক্রান্ত কি না তা পরীক্ষা করিয়ে নিতে হবে।

এসব জটিলতা আমায় ছুয়ে যায়নি এতোটুকু। সারাক্ষণ কামনা করছি আমার সন্তান যেন হয় এক সফল ও সুখী মানুষ।

চোখ বন্ধ করলেই অনুভব করি, কোল জুড়ে আমার স্বর্গীয় দেবদূত। তার তুলতুলে গালের ছোয়া, দুষ্টু মিষ্টি রাশি রাশি হাসি, বাকুম বাকুম শব্দে কথা বলা। রিনিঝিনি কান্নার পরশ, শান্ত–স্নিগ্ধ চাহনির মধুর আবেশে বিভোর আমি। অনাগত সোনাবাবু আমার। কেবলই আড়মোড়া ভেঙে জানান দিচ্ছে, আসছি মা। অতি শিগগিরই। উহ! কি অসহ্য সুখ। এই উপচে পড়া সুখে আমি হয়তো মরেই যাবো।

এস.এস.কে রোড, ফেনী থেকে

প্রথম অভিজ্ঞতা

– এম.এ. সামাদ

নাসরিন। পাশের বাসার মেয়ে। স্থানীয় স্কুলের ক্লাস নাইনের ছাত্রী। আমি ছিলাম তার প্রাইভেট টিউটর। আমি তখন পাকিস্তান সরকারের নবীন কর্মচারী। বিকাল দুইটা পর্যন্ত ছিল অফিস সময়। সান্ধ্য অবসরে তাকে পড়াতাম। আমাকে মামা বলে ডাকতো সে। তাদের আদি নিবাস নাকি ছিল মুর্শিদাবাদে।

চমৎকার মেয়ে। দুধে–আলতা গায়ের রঙ। চোখ দুটি মায়া ভরা, শারীরিক গঠন মনকাড়া। প্রাণ খুলে হাসতো। সে হাসিতে ছিল বিদ্যুতের ঝিলিক।

প্রায় বছরখানেক চলার পর বার্ষিক পরীক্ষা দিয়ে ক্লাস টেনে প্রমোশন পেল।

একদিন পড়াতে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই সে একটা অবাক কাণ্ড করে ফেললো। চটি একটা আমেরিকান মেডিকাল জার্নালের মাঝখানের পাতা খুলে আমার সামনে টেবিলের ওপর রেখে হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেল। এতে অনেকগুলো যুবতীর সম্পূর্ণ নগ্ন দেহের ছবি আমার চোখের দৃষ্টি কেড়ে নিল।

কেমন আছেন মামা? কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে সে আমার কাছে প্রশ্ন রাখলো। ঠোটে তার দুষ্টুমির হাসি।

কিছুটা রাগান্বিত ভাব দেখিয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, নাসরিন, তুমি এ কাজটি কেন করতে গেলে? আমি তো তোমার মামা–কাম–গৃহশিক্ষক। একটা লজ্জা–শরম থাকা দরকার।

ওমা! মামা তো বড় মজার সম্পর্ক। তাছাড়া আমার মা বলেছেন, আপনি নাকি জীবনে বিয়ে করবেন না। তাই মনে হলো নগ্ন নারী দেহ দেখে আপনার তো প্রতিক্রিয়া হবে না। চটপট কথাগুলো বলে রিডিং রুম থেকে বেরিয়ে গেল সে।

আমিও চলে এলাম।

পরদিন যখন গেলাম, তাকে অনেকটা গম্ভীর মনে হলো। ভয় পেলাম, আবার কি অঘটন ঘটায়। এরই মাঝে নাসরিনের মা রোজকার মতো শুধু এক কাপ চা পাঠিয়ে দিলেন।

তাকে কপট ভঙ্গিতে বললাম, তোমার মায়ের খালি চা খেতে খেতে ফেড আপ হয়ে গেলাম।

সে খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে উঠে দাড়ালো এবং আমার সামনে এসে বললো, চায়ের সঙ্গে ইচ্ছা করলে দুটো কিসও খেতে পারেন।

এই বলে সে তার মুখটা তুলে ধরলো।

আমি বিচলিত হলাম। এমন পরিস্থিতির জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না। মিনিট খানেক ভাবার পর আলতো করে তার সুন্দর মুখখানা তুলে নিলাম এবং গভীর স্নেহে তার ঠোটে দুবার কিস করলাম। এটাই ছিল আমার জীবনের প্রথম চুমু এবং সম্ভবত তারও প্রথম অভিজ্ঞতা।
সে শিহরিত হলো এবং এক নতুন অনুভূতি নিয়ে আমার চোখে চোখ রাখলো।
তারপরের ইতিহাস সম্পূর্ণ এক নতুন কাহিনী, না-ইবা বললাম এখানে। আজকের অবসর জীবনে যৌবনের সেসব দৃশ্য যখন মানসপটে জেগে ওঠে, তখন ধমনীতে জাগে নতুন এক চাঞ্চল্য।

পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম থেকে

বধূবরণ

– এস.এম. আছাব আলী

ঘটনাটা খুবই সাম্প্রতিক এবং মর্মান্তিক।
২৯ সেপ্টেম্বর ২০০২ সাল।
প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়েছি। বড় সড়ক থেকে আমাদের গ্রাম পর্যন্ত যে সংযোগ সড়ক এসেছে সেটাও পাকা। আশ্বিন মাস। দেড় কিলোমিটারের এই সরু সড়কটির দুই পাশে কচি শিশু গাছের সারি, বিস্তীর্ণ সবুজ ধান ক্ষেত। সূর্য তখনো ওঠেনি। প্রাতঃভ্রমণের এমন নীরব সৌন্দর্য সংসদ ভবনের চারপাশেও নেই।
প্রায় এক কিলোমিটার রাস্তা অতিক্রম করেছি। সাধ্যমতো জোরে হাটছি। হঠাৎ আমার ফুপাতো ভাই সাঈদ আমার সামনে এসে ব্রেক কষে মোটরসাইকেল থেকে নামলো। তার কালো চশমা চোখ থেকে খুলে পকেটে রাখলো। এক অজানা আশংকায় আমার বুক কেপে উঠলো। সত্যি, অন্যান্য দেশ যখন ক্রমেই সভ্যতার দিকে এগিয়ে চলেছে, আমরা তখন আশংকাযুক্ত জীবন যাপনে অভ্যস্ত হয়ে পড়ছি।
আসসালামু আলাইকুম।
খুব ভীতু কণ্ঠে বললাম, এতো সকালে! কোনো সমস্যা?
আমার স্ত্রী মারা গেছে।
কবে? কখন? কোথায়? এক ভিন্ন আতংকে জড়িয়ে পড়লাম।
গতকাল সন্ধ্যায়। তার বাপের বাড়ি। সে লো প্রেশারে আক্রান্ত ছিল। একা কলের পাড়ে গিয়ে মাথা ঘুরে পাকা সিমেন্টের ওপর পড়ে যায়। মাথার পেছন দিক ফেটে যায় এবং অজ্ঞান হয়ে পড়ে।
তারপর?
তারপর আর জ্ঞান ফেরেনি। সন্ধ্যায় মারা যায়।
সাঈদের মুখের দিকে তাকালাম। চোখে-মুখে অনুতাপ, অনুশোচনা, হতাশার ছাপ। তার স্ত্রীর নাম মমতাজ বেগম। দুই মেয়ে সিমি ও মিমি। দাম্পত্য কলহের কারণে দুই বছর আগে মমতাজ বেগম তার বাইশ বছরের গড়া সংসার ছেড়ে বাপের বাড়ি চলে যায়। তখন সিমি কলেজে এবং মিমি হাই স্কুলে পড়তো। পরবর্তী কালে মেয়ে দুটি বাপকে ছেড়ে মায়ের আশ্রয়ে চলে যায়। গত মার্চে মামারা তাদের পার্শ্ববর্তী গ্রামের একজন ভালো চাকরিজীবী ছেলের সঙ্গে সিমির বিয়ে দিয়েছে। সে এখন স্বামীর কর্মস্থল ঢাকার নবীনগরে। মিমি বগুড়ায় কোনো কলেজে পড়ছে।

মমতাজ বেগম তার ভাইদের আশ্রয়ে নিঃসঙ্গ ছিল। সে আমার সঙ্গে ওয়াদা করেছিল, মেয়ে-জামাই, স্বামীসহ আগামী ঈদ তার নিজ বাড়িতে করবে। সে তার স্বামীকে সুখী করতে চেয়েছিল। এখন তার মৃত্যুর খবর এলো!

ভাইজান!

সাঈদের ডাকে আমার চিন্তায় ছেদ পড়লো। বাকিটুকু পরে বলবো, আগে সাঈদের সঙ্গে কথা বলি। জিজ্ঞাসা করলাম, দাফন কোথায় করবে?

আমার পারিবারিক গোরস্থানে। বাদ আসর জানাযা হবে। আমি সব ব্যবস্থা করে এসেছি, শুধু মেয়ে দুটির ব্যবস্থা আপনি করুন। তার মোবাইলটা আমার দিকে এগিয়ে দিল।

দুর্ভাগ্য, ফোনটা সিমি ধরলো।

গুড মর্নিং, সিমি বলছি।

মামণি, আমি বড় চাচা বলছি।

আসসালামু আলাইকুম বড় চাচা, কেমন আছেন, মা কেমন আছে?

আমার পাশে দাড়ানো তার বাবা তখন কাদছে। শরতের এই নীরব সুন্দর সকালে সূর্যের প্রথম আলো ততোক্ষণে আমাদেরকে স্পর্শ করেছে যেন বলছে সত্যই সুন্দর। তবু মিথ্যা বলার প্রয়োজন হলো। হে আল্লাহ। তুমি তার মাকে ক্ষমা করো। ভালো, সব ভালো, মা মণি একটু জামাই মিয়ার সঙ্গে কথা বলতে চাই।

একটু ধরুন।

জামাইকে তার শাশুড়ির মৃত্যু সংবাদ দিলাম। বিস্তারিত বুঝিয়ে বললাম, অফিসের অথবা ভাড়ায় যে কোনো একটা স্বতন্ত্র গাড়িতে করে সোজা শ্বশুরবাড়ি আসবে, পথে বগুড়া থেকে মিমি-কে তুলে নেবে। বলবে, তাদের বাবার অসুখ। মায়ের কথা মোটেও বলবে না, রাস্তায় ভোগান্তি হবে।

আমাকে তার বাড়িতে খুব তাড়াতাড়ি যাওয়ার অনুরোধ জানিয়ে সাঈদ চলে গেল।

আমি মনে করি, প্রত্যেক মানুষের একটি জীবন আছে। সেই জীবনের একটি গল্প আছে। সেই গল্পে অনেক সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনার কথা আছে। সেই জীবনের মুল ভিত্তি হলো দাম্পত্য জীবন। দাম্পত্য জীবনে যারা সুখী তারাই প্রকৃত সুখী। সাঈদ ও তার স্ত্রী মমতাজ বেগম দীর্ঘ বাইশ বছরে কোনোদিন সুখের মুখ দেখেনি। তবু তাদের সুখ-দুঃখের শেষ সম্বল ছিল দুটি মেয়ে। তারাও যখন তাদের মায়ের আশ্রয়ে চলে যায় তখন সাঈদ সত্যি সত্যি খুব নার্ভাস হয়ে পড়ে। তাকে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে তার সব আত্মীয়স্বজন ব্যর্থ হওয়ার পর সাঈদ আমার কাছে আসে। আমিও ব্যর্থ হই। মেয়ে দুটির একই কথা, মাকে ছাড়া আমরা বেচে থাকতে চাই না।

কিন্তু তাদের মা অথবা বাবা কেউ কারো মুখ দর্শন করতে চায় না। সাঈদের জমজমাট সংসার, বিরাট বাড়ি-ঘর, রান্না-খাওয়া সব কিছু নিঃসঙ্গতার আড়ালে ঢাকা পড়ে। তখন সে সিদ্ধান্ত নেয় যে, সে আবার বিয়ে করবে। গত জুন মাসে জামাই তার কর্মস্থলে সিমিকে নেয়ার জন্য বাড়ি আসে। তখন তার বাড়িতে আমারও ডাক পড়ে।

জামাই আমাকে বলেছিলেন, আমি আম্মাকে রাজি করিয়েছি। কিন্তু তিনি সিমি-মিমি ও আমাকেসহ সে বাড়ি যেতে চান।

আমি সিমি-মিমি ও তাদের মায়ের মুখের দিকে তাকালাম।

মমতাজ বেগম বললো, হ্যা ভাইজান, জামাই ঠিকই বলেছে, আমি আমার ঘরে ফিরে যাবো এবং তাকে সুখী করার চেষ্টা করবো। জামাইয়ের সব ছুটি শেষ হয়েছে, আগামী রোজার ঈদে আবার ছুটি পাবে। আপনার ভাইকে সেভাবেই আপনি ম্যানেজ করুন।

একদিন সাঈদের বাড়িতে গেলাম। দেখা হলো। তার স্ত্রী, জামাই, কন্যাদের ইচ্ছার কথা তাকে জানালাম।

সে তা নাকচ করে দিয়ে বললো, ভাইজান, আমি বিয়ে ঠিক করে ফেলেছি।

তার সঙ্গে আমার অনেক কথা হলো এবং হতাশ হলাম। তবু শেষ চেষ্টা চালিয়ে বললাম, তোমাকে একজন সংযমী ব্যক্তি বলে মনে করি এবং তোমার ইচ্ছা ও অনুভূতিকে শ্রদ্ধা করি। তবু বলছি, তোমার বয়স তোমার সঙ্গে প্রতারণা করেছে। সেই জীবন আর ফিরে আসবে না। সেই বাসরঘর কেউ সাজাবে না। আচ্ছা, প্রথম রাতে বিড়াল মারার গল্পটি কি জানো?

না।

পৃথিবীর প্রথম হত্যাকাণ্ড নারীঘটিত, তা কি জানো?

না।

এসব গল্প আর একদিন বলবো। আজ শুধু এতোটুকু বলবো, *যৌবনে হোক বা বার্ধক্যে হোক পুরুষের জন্য বহুপত্নীক বা বিপত্নীক কোনো জীবনই ভালো নয়।*

এবার সে পকেট থেকে গুলের কৌটা বের করে ডান হাতের তর্জনি দিয়ে দাত মাজতে লাগলো। মনে হলো সে চিন্তাযুক্ত হয়ে পড়েছে। সিদ্ধান্ত হাতড়াচ্ছে।

আমি নাটকীয়ভাবে তার কাছে উঠে গেলাম। তার ড্রয়ার থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে একটা ধরালাম। এক মুখ ধোয়া তার নাক–মুখের ওপর নিক্ষেপ করলাম। তার পকেট থেকে গুলের কৌটা বের করে তার নাকের সামনে মেলে ধরে বললাম, তোমার এই ছোট ছোট অভ্যাসগুলো তোমার কাছে সুন্দর। কিন্তু তোমার স্ত্রীর কাছে এগুলো কতো অসুন্দর, নোংরা, অসহনীয় ছিল তা কি গত বাইশ বছরে তাকে কখনো জিজ্ঞাসা করেছো?

সে হতবাক হয়ে আমার মুখের দিকে তাকালো।

তার কাধের ওপর হাত রেখে স্নেহের সুরে বললাম, স্ত্রীর কাছে আমাদের অনেক দোষ আছে যা আমরাও জানি না। আমরা ঘরে বসে ঘরের কাহিনী জানি না, ঘরের মানুষকে চিনি না। সম্রাট শাহজাহান তার সাম্রাজ্ঞী মমতাজ বেগমের সমাধির ওপর *তাজমহল* গড়েছেন। কিন্তু তোমার অসুখী স্ত্রী মমতাজ বেগমের মাটির ঘরে সুখের প্রদীপ তুমি জ্বালাতে পারোনি।

তার দুই চোখ অশ্রুতে ভরে গেল।

সে তোমাকে ক্ষমা করেছে, তুমিও তাকে ক্ষমা করো এবং তুমিই হবে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম স্বামী।

সে তার মাথা নত করলো।

সাঈদও আগামী ঈদের প্রতীক্ষায় ছিল। কিন্তু হলো না। এসব কথা থাক।

দুপুর বারোটার পর থেকেই লাশ বহনকারী মাইক্রো বাস এসে গেল। চব্বিশ বছর আগে সে নববধূর সাজে গরুর গাড়িতে চড়ে এই বাড়িতে এসেছিল রাতে। আত্মীয়স্বজনরা তাকে আনন্দের সঙ্গে বরণ করে নিয়েছিল। সে রাতে তার জন্য তৈরি করা হয়েছিল সুখের বাসরঘর। সুখ তার জীবনে আসেনি। আজ সে মাইক্রো বাসে চড়ে তার ঘরে ফিরে এলো লাশ হয়ে। তার জন্য তৈরি করা হয়েছে কবর। আমরা শোকার্ত আত্মীয়স্বজন তাকে বরণ করে নিলাম।

বিকাল সাড়ে তিনটার দিকে আরো একটি মোটর গাড়ি এলো। সাঈদের দুই মেয়ে ও জামাই নামলো। মেয়েরা তাদের সুস্থ বাবাকে ও অনেক লোকজন দেখে হতবাক হয়ে গেল। সাঈদ তার দুই মেয়েকে দুই বাহুতে জড়িয়ে ধরে স্ত্রীর মরদেহের কাছে নিয়ে গেল... বাকিটুকু নাই–বা শুনলেন। ঈদের এখনো অনেক দিন বাকি, ততোদিন তুমি শান্তিতে ঘুমিয়ে থেকো মা...।
এই জীবন সেই জীবন নয়।
এই দেহ সেই দেহ নয়।
আমরা সবাই প্রকৃতির ফাদে বন্দী যেন মৃত্যুই তার শেষ পরাজয়।

বড়গাছা, জয়পুরহাট থেকে

নিরানন্দ

– মোহাম্মদ শওকত হাসনাত

প্রত্যেক ধর্মপ্রাণ মুসলমানের জন্য ঈদ মানেই আনন্দ। শিশু থেকে বৃদ্ধ পর্যন্ত সবাই প্রতীক্ষায় থাকে ঈদ উৎসব আগমনের। ধনী–গরিব, সর্বস্তরে ঈদ বয়ে আনে অনাবিল আনন্দের প্লাবন। ঈদ যতোই ঘনিয়ে আসে ততোই নানান রকম কেনাকাটায় মানুষের ব্যস্ততা বাড়তে থাকে। বাড়তে থাকে সুন্দর পোশাকের প্রতিযোগিতা। সকল মানুষের নতুন জামা–কাপড় পরে ঈদ উদযাপনের সেই আনন্দ অনুভূতি লিখে বোঝানো আমার পক্ষে সম্ভব নয়।
আমার ঈদ আনন্দ বরাবরই ঝাপসা। চারদিকে প্রাচুর্যের সমাহার, মাঝখানে ভাঙা ঘরে আমরা এমন অবস্থায় আট ছেলেমেয়েকে অসহায় মায়ের হাতে সপে দিয়ে বাবা যখন পাড়ি দিলেন পরপারে তখন আমি মাত্র ক্লাস সেভেনে পড়ি আর বড় ভাই ক্লাস এইটে। বড় দুই বোনের একজন সদ্য বিবাহিতা, অন্যজন ক্লাস টেনের ছাত্রী। সবার ছোট বোন রাজু যার বয়স তখনো বছর পূর্ণ হয়নি। শূন্য হাতে এতো বড় সংসার নিয়ে মায়ের এই দুঃসহ কষ্টের জীবনে শুধু বেচে থাকাই যেখানে দুঃস্বপ্ন সেখানে ঈদের আনন্দ মানেই কল্পনাবিলাস।
সেই ১৯৮১ সাল থেকে আজ পর্যন্তও আমার জীবনে পরিপূর্ণ আনন্দের ঈদ আসেনি। ঈদ উপলক্ষে নিজের জন্য আজো কেনা হয়নি নতুন জামা। খুব ইচ্ছা ছিল, আপনজনদের প্রত্যাশা পূরণ করে যেদিন এক সঙ্গে ঈদ করতে পারবো সেদিনই নিজের জন্য নতুন জামা কিনে আনন্দ মেলায় শরিক হবো। প্রত্যাশার সঙ্গে প্রাপ্তির অসামঞ্জস্যতায় সে স্বপ্ন আজো পূরণ হয়নি।
১৯৯৩ সাল থেকে আমি প্রবাসী। সে সূত্রে ঈদের আনন্দ আমার কাছে শুধুই ঝাপসা স্মৃতি। কালের পরিক্রমায় এখানেও বার বার ফিরে আসে ঈদ। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমার, এ ঈদ আনন্দের বার্তা নয়, নিয়ে আসে কষ্টের বন্যা। প্রবাসের সীমাহীন কষ্ট ঈদ আগমনে যেন আরো তীব্র হয়ে ওঠে। এ যেন আমার একাকীত্বকে স্মরণ করিয়ে দিতেই ঈদের বার বার ফিরে আসা। এখানে ঈদের সকাল মানেই চারদিকে শূন্যতার হাহাকার। লুকিয়ে লুকিয়ে চোখের জল ফেলা। ঈদের আগমন হয় অনেকটা নীরবে নিভৃতে। রমজানের কারণে ঈদুল ফিতরের আগমন কিছুটা অনুমান করা গেলেও কোরবানির ঈদের আগমন দূরে থাক, ঈদের দিনই বোঝার উপায় থাকে না। এই তো গত কোরবানি ঈদে সহকর্মী ও বন্ধু স্বপনের আগ্রহে পশু জবাই দৃশ্য দেখার চেষ্টা করেও ব্যর্থ

হই। কারণ এখানে শুধু মসজিদের এরিয়ার ভেতর আলাদা প্যান্ডল করে তার ভেতর কোরবানি দেয়া হয়।

সিঙ্গাপুরে কর্মরত অধিকাংশ বাংলাদেশিই নির্মাণ শ্রমিক। এক ঋতুর দেশ হওয়ায় এখানে সারা বছরই গরম। একদিকে অক্লান্ত পরিশ্রম, অন্যদিকে গরম, যে জন্য ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও অনেকের পক্ষে রোজা রাখা অসম্ভব হয়ে পড়ে। কখনোই স্বইচ্ছায় রোজা নষ্ট করিনি। প্রবাসে সাত বছর প্রতিটা রোজা পালন করেছি। অথচ গত রমজানে শারীরিক অসুস্থতা ও কঠিন পরিশ্রমের কারণে রোজা রাখতে পারিনি। আমার মতো আরো অনেকের জন্যই এ যে কতো কষ্টের তা বলে বোঝানো যাবে না।

সিঙ্গাপুরে ঈদের দিন সরকারি ছুটি থাকে। এ সুযোগে সব বাংলাদেশি মুসলমান ভাইয়েরা দূর–দূরান্ত থেকে খুব সকালেই বিভিন্ন মসজিদে গিয়ে হাজির হয়। আমাদের দেশের মতো খোলা মাঠে বা ঈদগাহে ঈদের নামাজের ব্যবস্থা এখানে করা হয় না। শুধু মসজিদেই ঈদের নামাজ অনুষ্ঠিত হয়। রঙবেরঙ–এর সাজ পোশাকে বিভিন্ন ভাষাভাষী নারী–পুরুষ এক জামাতে ঈদের নামাজ আদায় করে। উল্লেখ্য, এখানে প্রত্যেক মসজিদে মহিলাদের জন্য একই জামাতে নামাজ আদায় করার জন্য আলাদা ব্যবস্থা আছে। ঈদের জামাত শেষে বাংলাদেশি ভাইদের মধ্যে কোলাকুলির দৃশ্য দেখে বিদেশিরা অপার আনন্দে চেয়ে থাকে। এতো আনন্দের মাঝেও অনেকের চোখের জল ফেলার দৃশ্য বাকি সবাইকে দেশে ফেলে আসা স্বজনদের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। যারা পুরনো তারা অতি কষ্টে চোখের জল চেপে রেখে নতুনদের সান্ত্বনা দেয়। এভাবেই একদিন সবার চোখের জল শুকিয়ে আসে।

আবারও ঈদ প্রায় সমাগত। আমার জন্য এবারের ঈদের কষ্ট হবে সবচেয়ে বেদনাদায়ক। আমার একটা ছেলে আছে। দেখতে খুবই সুন্দর। আমার মা বললেন, ছোটবেলায় আমিও নাকি অবিকল একই রকম ছিলাম। প্রবাসের অভিশপ্ত জীবনের কল্যাণে আজও ছেলের মুখ দেখিনি। একবার শুনি সে হাসে। আবার শুনি সে হামাগুড়ি দিয়ে বসতে পারে। তারপর খবর আসে তার দাত উঠেছে। এখন নাকি আবার একটু একটু করে বাবাকে ডাকছে। ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে পৃথিবীর সবচেয়ে আশ্চর্যের দৃশ্য দেখা থেকে আমি বঞ্চিত। আগামী ঈদই হবে আমার সোনামণির প্রথম ঈদ। অথচ তার পাশে থাকতে পারবো না, এর চেয়ে কষ্ট আর কি হতে পারে! নারকীয় কষ্টের দুঃসহ জীবন এভাবে কতোকাল চলবে জানি না। ঈদের আগমনে আমার মতো লাখ লাখ প্রবাসীর বেদনা যেন আরো শতগুণ বেড়ে যায়। ঈদের দিনই প্রবাসীরা অনুভব করে সবচেয়ে বেশি একাকীত্ব। তাই আমাদের জন্য ঈদ মানেই কষ্ট।

সিঙ্গাপুর থেকে

ভালোবাসার বেশে নীতিহীনতার দেশে

– ইন্দ্রানী

দেখতে অসুন্দরী না হলেও কোনোভাবেই সুন্দরী নই। বাবা–মা গত হয়েছেন বেশ কয়েক বছর। গায়ের রঙ কালো। অবিবাহিতা। ছোটখাটো একটা চাকরি করি। মূল ঘটনাগুলো পড়তে পড়তে পাঠক এই বর্ণনাটুকু মিলিয়ে নেবেন।

ঘটনা এক.

১৯৯৫ সালের কথা। চাকরি করি একটি এনজিওতে। অফিসের প্রধান কাজ হচ্ছে দুঃস্থ মহিলা ও শিশুদের পুনর্বাসন করা। কাজের সূত্রে পরিচয় হলো আতিকভাইয়ের সঙ্গে। কিছুটা অন্তরঙ্গতা তৈরি হওয়ার পর আরেক কলিগের মাধ্যমে পাঠালেন বিয়ের প্রস্তাব। মনের ভেতর দ্বিধাদ্বন্দ্ব। কারণ আতিকভাই সম্পর্কে নানান ইঙ্গিতপূর্ণ ফিশ ফিশ সুরে কথা শুনি। এক সময়ে দ্বন্দ্বের অবসান হলো। আমাদের অফিসের ক্লায়েন্ট দুইজন গরিব মহিলার সঙ্গে নিয়মিত অবৈধ সম্পর্ক স্থাপনের অভিযোগে অফিস কর্তৃপক্ষ আতিক সাহেবকে বরখাস্ত করলো।

ঘটনা দুই.

কাজ করি অ্যাকাউন্ট সেকশনে। অ্যাডমিন সেকশনের রুহুলভাই আর শম্পাআপার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হলো। সময়ের চাকা ঘুরতে ঘুরতে এক সময়ে রুহুলভাই দিলেন প্রেমের প্রস্তাব। কিছুদিন মনের মধ্যে একটা উড়ু উড়ু ভাব এলো। মনে হলো পিঠে যেন দুটো ডানা একটু একটু গজাচ্ছেও। একদিন শম্পাআপা খুশিতে গদ গদ আর আহ্লাদে আটখানা হয়ে জানালেন রুহুলভাই তাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছেন। জানতে চাইলেন রুহুলভাইকে আমার কেমন মনে হয়। শম্পাআপার মুখ দেখে বুঝলাম যদিও তিনি আমার মতামত চাইছেন তবুও নেতিবাচক মন্তব্য ওনার ভালো লাগবে না। তাই মনরাখা কথাই বললাম। কিছুদিনের মধ্যেই শম্পা–রুহুল জুটি অফিসে খ্যাতি পেয়ে গেল। তারপর রুহুলভাই একদিন বিয়ের কার্ড বিলি করলেন। এ বিয়ের বর ঠিক থাকলেও কনে অবশ্যই শম্পাআপা ছিলেন না।

ঘটনা তিন.

ছেলেপক্ষ দেখতে আসবে। শুনলাম ছেলেটি একটি পত্রিকা অফিসে ছোটখাটো পদে কাজ করে। হাপ ছেড়ে বাচলাম। বড় মানুষের ধরার ক্ষমতা তো আমার নেই। এ উপলক্ষে বাড়িতে লোকজনও কম নয়। সন্ধ্যার কিছু পরে পাত্র ও পাত্রের তিন ভাই এবং ভাবীরা থৃ–পিস, সুট ও কাতান বেনারসিতে নিজেদের জড়িয়ে আসনে বসলেন। মেয়ে দেখতে কেউ থৃ পিস, সুট আর বেনারসি শাড়ি পরতে পারে আমার জানা ছিল না। মোট কথা, তাদের ভাবখানা এমন, দেখো, দেখো আমাদের কতো আছে। সময় মতো আমাকে উপস্থাপন করা হলো। আপ্যায়ন এবং খুচরা কথার পর তারা সুনির্দিষ্টভাবে জানতে চাইলো, আমি কতো টাকা বেতন পাই। বছরে বোনাস পাই কি না। অর্থনৈতিক দিক থেকে আমার আর কি কি সুবিধা আছে।
অনেক কষ্টে মাথা ঠাণ্ডা রেখে সেদিনের লৌকিকতা শেষ করেছিলাম।

ঘটনা চার.

১ অক্টোবর ২০০২। ছেলেটিকে দেখেই মনে হলো, কমপক্ষে তিন চার বছরের ছোট হবে সে আমার থেকে। শুনলাম শিক্ষা সংক্রান্ত একটি প্রজেক্টের সে ফিল্ড অফিসার। ছেলেটি আমাকে পছন্দ করলো এবং সেদিনই আংটি পরাতে চাইলো। শুনে খুশি হওয়ার বদলে আতংকে অস্থির

হলাম। বড় ভাইয়া বাধা দিয়ে বললেন, ছেলের খোজখবর না নিয়ে এনগেজমেন্ট হবে না। পরে খোজ নিয়ে জানা গেল ছেলেটির চাকরি ভুয়া এবং সে বেকার।

আমার পরিচিত জগতের লোকদের কাছে এসব ঘটনা কোনো রেখাপাত করে না। তাই কাউকে এসব কথা মন খুলে বলি না।

ঢাকা থেকে

টান

আমার জীবনে এমন ঘটনা ঘটবে তার জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না। নিজেকে নিয়ে সব সময় একটা অহংকার করতাম। আজ সেই অহংকার ধুলায় মিশে গেল শুধু আমার ভুলের জন্য। আয়নার সামনে দাড়ালে নিজেকে পৃথিবীর একটা নিকৃষ্ট জীব বলে মনে হয়। তীরের কূলে এসে জীবনের নৌকা ডুবিয়ে দিলাম। এ যে কি কষ্ট! আমার মতো হতভাগারা বুঝতে পারবে। পচিশটি বসন্ত পেরিয়ে ছাব্বিশটি বসন্তে পা দিতেই জীবনের চরম ভুল করে ফেললাম।

আমি উচ্চতায় পাচ ফিট দশ ইঞ্চি, নম্র, ভদ্র, সুদর্শন ও স্মার্ট হওয়াতে এলাকার মানুষ আমাকে যথেষ্ট মূল্যা দিতো। এলাকার সবার ঘরের দরজা আমার জন্য খোলা ছিল। আমিও ঠিক সেভাবেই চলতাম যাতে আমার কোনো দুর্নাম না হয়।

এরই মধ্যে কিছুদিন বিদেশ থেকে দেশে ফিরলাম। ঘনিষ্ঠ বন্ধু–বান্ধবীর বাসায় গেলাম তাদের খোজ নিতে। বন্ধুদের পেয়ে তাদের সঙ্গে আড্ডা মেরে দিনের অনেক সময় পার করে দিতাম। ভালোই কাটছিল দিনগুলো। এর মধ্যে নতুন এক ভাবীর সঙ্গে পরিচিত হলাম। ওই ভাবীর সঙ্গে যতোক্ষণ গল্প করতাম ততোক্ষণ আমার মুখের দিকে তিনি একনজরে থাকিয়ে থাকতেন। অগত্যা আমিই চোখ নামিয়ে নিতাম।

ঈদ এলো। শুভেচ্ছা জানালাম। ঈদের দিন তিনি নীল শাড়ি পরেছেন। অপূর্ব লাগছে ভাবীকে! আমিও পায়জামা, পাঞ্জাবি পরে ভাবীর সামনে গেলাম। তিনিও একনজরে তাকিয়ে আছেন আমার দিকে। তখন দুষ্টুমি করে ভাবীকে বললাম, এভাবে আমার দিকে না তাকিয়ে নিজেকে দেখুন কতো সুন্দর লাগছে।

ভাবী মিষ্টি হাসি দিয়ে বললেন, আসল সুন্দর তো এখনো দেখোনি। বিয়ে করো, পরে দেখতে পারবে।

বললাম, বৌ পাবো কোথায়?

উত্তরে বললেন হাত বাড়ালেই পাবে।

কিছুদিন চলে গেল। আস্তে আস্তে ভাবীর সঙ্গে ফৃ হয়ে গেলাম। এখন আর কোনো জড়তা নেই।

একদিন বিকেলে ভাবী বললেন, তুমি আজ রাত বারোটায় আমার বাসায় এসো। বাসায় কেউ নেই। সারা রাত দুইজনে গল্প করবো।

আমিও এক অজানা সুখের আশায় রাত বারোটায় তার দরজায় নক করি। সঙ্গে সঙ্গে খুলে দিলেন। মনে হয় তিনি দরজার পাশেই দাড়ানো ছিলেন। ভাবী দরজা বন্ধ করে দুইজন ডিম লাইটের আলোতে সোফায় বসে গল্প শুরু করলাম। আমার হাত ধরে ভাবী গল্প করছিলেন।

এক সময় আমার হাত তার বুকে নিয়ে চেপে ধরতেই নিজের হাত টান দিয়ে বললাম, প্লিজ! আমিও রক্ত, মাংসে গড়া মানুষ।

নিজের মান–সম্মানের কথা চিন্তা করে তাকে অনেক অনুরোধ করলাম দুর্ঘটনা না ঘটানোর জন্য। আমাকে উল্টো ভয় দেখিয়ে তিনি বললেন, আমি যদি এখন চিৎকার করে মানুষ ডাকি তখন কোথায় থাকবে তোমার মান–সম্মান?

ভাবীর কথায় চুপসে গেলাম। মনে মনে ভাবলাম, কেন যে তার কথায় এতো রাতে এলাম? ভাবীর কথায় সাড়া দিলাম। তারপর যা হবার তাই হলো। জীবনে এই প্রথম নারীর সঙ্গ পেলাম। সারা রাত দুইজন একে অপরকে জড়িয়ে ধরে শুয়েছিলাম।

এরপর থেকে ভাবী সময়–সুযোগ পেলেই আমাকে ডাকতেন। আমিও তার কোনো কথা আর অমান্য করিনি। ভালোই লাগতো।

এভাবে প্রায় দুই মাস কাটানোর পর হঠাৎ আমার বিয়ের কথাবার্তা শুরু হলো।

ভাবীকে বলতেই তিনি বললেন, আমি তো তোমার বৌ আছিই। এরপরও বিয়ে?

একদিন হবু বৌয়ের বাসায় গেলাম। প্রায় এক ঘণ্টা আমি আর হবু বৌ পাশাপাশি বসে গল্প করলাম। দুইজনের মধ্যে অনেক কথাবার্তা হলো। হবু বৌটি দেখতে সুন্দর। দুইজনকে মানাবে ভালো। দুই পরিবারের পছন্দ হয়ে গেল। বাসায় এসে নিজের কৃতকর্মের জন্য অনেক কাদলাম। মনে হচ্ছিল আমি যেন হবু বৌকে ঠকিয়েছি। এদিকে ভাবীও আমাকে পাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়ছে। তার শেষ কথা, স্বামী দেশে এলেই তাকে ডিভোর্স দিয়ে আমাকে বিয়ে করবে। সে অনেক কথা।

পড়ে গেলাম মহাবিপদে। মান–সম্মানের কথা চিন্তা করে তাড়াতাড়ি দেশ থেকে চলে এলাম। মা এবং আমার আপন ভাবীকে বললাম, ওই বৌ আমার পছন্দ হয়নি। তাছাড়া এখন বিয়ে করা সম্ভব নয়।

ব্যবসার দোহাই দিয়ে সময়ের অভাব দেখিয়ে ওই বিয়ে ভেঙে দিই। অবশ্য পাত্রীপক্ষ সময় চেয়েছিল। আমি না করে দিয়েছি। পরকীয়া প্রেম ঠিক রেখে ভাবীকে বুঝিয়ে দেশ থেকে চলে আসি।

ভাবী চোখের পানি, একটা শার্ট, একটা টুথব্রাশ ও চারটা প্রিয় গানের ক্যাসেট উপহার দিয়ে বিদায় দিলেন।

এখানে এসেও ঠিকমতো ব্যবসায় মন দিতে পারছি না। সারাক্ষণ ভাবীর সঙ্গে ফোনে, মোবাইলে কথা বলি। যেদিন ভাবি, আর যোগাযোগ রাখবো না সেদিন আরো বেশি কথা হয়ে যায়।

এ যেন কেমন টান বুঝতে পারি না।

সারাদিন আনমনা হয়ে কি যেন ভাবি।

পত্রিকার প্রথমেই উল্টে দেখি আজ কয়টা ধর্ষণের খবর ছাপা হয়েছে। কারণ ধর্ষিতার আর্তনাদ আমি এখন উপলব্ধি করতে পারি।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, জেদ্দা থেকে

নিষ্ঠুর সত্য

– অনামিকা

আমি আমার বাবা মায়ের একমাত্র মেয়ে। বড় আদরের। স্কুল পড়ুয়া দুটি ছোট ভাই আছে। আমি কলেজের সেকেন্ড ইয়ারের ছাত্রী।

আমার বাবা খুব শান্তমেজাজি, স্বল্পভাষী, দায়িত্বপরায়ণ ও চাকরি জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত। দৈনিক পাচ ওয়াক্ত নামাজ তার কখনো ভুল হয় না। রোজ বাড়ি ফিরেই আমার নাম ধরে ডেকে বলেন, এক গ্লাস পানি দেতো মা।

কলেজে অনেকেই আমাকে রূপবতী জানে। এরই মধ্যে দুই এক জায়গা থেকে বিয়ের প্রস্তাব এসেছে। বাবা নাকচ করে দেন। গর্ব ভরে বলেন, আরো ভালো পাত্র দেখে মেয়ে বিয়ে দেবো আমি।

আমার মামাবাড়ি ঢাকার ধানমন্ডিতে। গত বছর শেষের দিকে বড় মামা–মামি এলেন। যাবার সময় আমাকেও নিয়ে যেতে চাইলেন ঢাকায় কিছুদিন বেড়িয়ে আসার জন্য। আমি মহা আনন্দে রাজি।

লিজাআপু মামার বড় মেয়ে। মেডিকালে সেকেণ্ড ইয়ারের ছাত্রী। একদিন হলে যাচ্ছেন, আমাকেও নিয়ে গেলেন তার সঙ্গে। বিথীআপুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন যিনি লিজাআপুর সহপাঠী, বান্ধবী, সহমর্মী এবং অনেক কিছু। আমরা বিথীআপুর রুমে বসলাম। আলাপচারিতা শুনে বোঝা যায়, তারা দুজনেই খুব অন্তরঙ্গ। বিথীআপু খুব কালো। তবে মায়াবী চেহারা। এতো মিশুক ও অমায়িক যে, আমাকে অল্পক্ষণেই আপন করে নিলেন।

কিছুক্ষণ পর লিজাআপু চলে গেলেন অন্য ক্লাসমেটরদের সঙ্গে দেখা করার জন্য। বিথীআপু আমাকে বসিয়ে রাখলেন। বললেন, গেস্ট নিয়ে এসেছিস, তাকে আমি চা সিঙারা খাওয়াচ্ছি। তুই ঘুরে আয়।

চা সিঙারা খাওয়া হলে বললেন, তুমি একটু বসো, আমি পাচ মিনিটে গোসল সেরে আসছি।

একা একা ওনার টেবিলের বইপত্র নেড়েচেড়ে দেখছিলাম। ডাক্তারির বিশাল বিশাল বই ছাড়াও চার পাচটি ম্যাগাজিন ও ভারতীয় লেখকদের উপন্যাস রয়েছে এক পাশে। আনমনে একটা উপন্যাস হাতে নিয়ে পাতা উল্টাচ্ছিলাম।

হঠাৎ চোখ আটকে গেল উপন্যাসের পাতার ভেতর রাখা একটি ছবিতে।

আমার চোখের পলক যেন পড়তেই চায় না।

বর–কনে বেশে দুইজন নারী–পুরুষের ছবি।

লোকটার ছবি দেখে মাথা ঘুরে উঠলো।

বাবার ছবি! মায়ের সঙ্গে বিয়ের ছবিতে তোলা বাবা দেখতে হুবহু একই রকম। তবে পাশের ছবিটি মায়ের নয়।

নিঃশ্বাস আটকে গেল বুকের পাজরে। সব কিছু এক ঘূর্ণিঝড়ে ওলোট–পালোট হয়ে গেল। কি অসীম রহস্য জীবনের অলি–গলিতে। কতোক্ষণ মনুমেন্টের মতো স্থবির বসে ছিলাম মনে নেই। পদশব্দে সংবিৎ ফিরে পাই। ছবিটা রেখে দিই যথাস্থানে।

গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে ছিল, তবুও আমার প্রশ্নের উত্তরে বিথীআপু উত্তর দিয়েছিলেন। তাদের বাড়ি রাজশাহী এবং বাবা মা কেউ নেই। নিঃসন্তান মামা তাকে মানুষ করেছেন।

এক একটি বিকেলে মানুষের বয়স কতো বেড়ে যায়। কতো অভিজ্ঞতা হয়ে যায় জীবনে। দুই দিন পর ফিরে আসি চট্টগ্রামে। ঘুম নেই, খাওয়া নেই, চোখের নিচে কালি। এক রাতে চোখের পানি সংযত করতে না পেরে নিরিবিলিতে বাবাকে জিজ্ঞাসা করলাম সব কিছু। মনে দ্বিধা ছিল। নাম ও চেহারায় মিল থাকলেও হয়তো ছবির মানুষটি আমার বাবা নয়, অন্য কেউ।

কিন্তু আমার কাছে বাবা নিজেকে আড়াল করলেন না।

দাদার পরম বন্ধু রাজশাহীর এক স্কুল মাস্টারের মেয়ে-র সঙ্গে বাবার অমত অগ্রাহ্য করে দাদা বিয়ে স্থির করেন। দাদা তখন মৃত্যুশয্যায়। কালো মেয়েকে অপছন্দ করা সত্ত্বেও বাবা বিয়েতে রাজি হন। ছয় মাস পর দাদা মারা যান। বাবা সুখী ছিলেন না। ও রকম কালো স্ত্রীকে সহ্য করতে পারতেন না। এক বছর পর কোল জুড়ে এলো কন্যা সন্তান। সেও কালো। মায়ের মতো। বাবা সব ছেড়ে-ছুড়ে চলে আসেন। সম্পর্ক রাখেননি আর। কিছুদিন পর সেই স্ত্রীর মৃত্যু সংবাদ পেয়েও তিনি মেয়ের সব দায়দায়িত্ব উপেক্ষা করেন।

আমার যে বাবা আমার কাছে আদর্শ ছিল, কাচের আয়নার মতো টুকরো হয়ে গেল সেই প্রতিবিম্ব। ভাবি, আমার গায়ের রঙ ও রকম কালো হলে আমিও হয়তো বিথীআপুর মতো পিতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত হতাম।

বাবা জানেন না কালো সন্তানকে অস্বীকার করে তিনি নিজেকে কতোটা কলঙ্কিত করেছেন।

লেখিকার পারিবারিক সম্পর্কের কথা ভেবে চরিত্রগুলোর নাম ও ঠিকানা প্রকাশ করা হলো না।

-যাযাদি

বেছে নিন

– আফসানা কিশোয়ার

যে পৃষ্ঠায় আপনি এসেছেন যাযাদির সেই পাতার লেখাটা পড়তে হলে আপনার কিছু বৈশিষ্ট থাকতে হবে। উল্লিখিত প্রশ্নগুলোর আলোকে নিজের বৈশিষ্ট লেখাপড়ার উপযুক্ত কি না যাচাই করে নিন ঝটপট :

ক. আপনি কি একজন মানুষ?

খ. আপনি কি একজন পুরুষ?

গ. আপনার কি বিবেক আছে?

এই প্রশ্নটা গৌণ, আপনি কি ধর্মে বিশ্বাসী?

এবার উত্তরগুলো জেনে নিয়ে পড়ুন দুটি ঘটনা মনোযোগের সঙ্গে।

ঘটনা এক.

মিসেস রিনা সব রকম যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও চাকরি করেননি স্বইচ্ছাতেই। কারণ তার প্রয়োজন নেই এবং স্বামী-সন্তানকে সংসারে সময় দিতেই বেশি ভালো লাগে। তার মেয়ের বয়স সাত বছর। মেয়েকে সকালে স্কুলে নিয়ে একেবারে ছুটির পরে আবার নিয়ে আসাতেই তার দিনের বড়

অংশ ব্যয় হয়। স্কুলে অভিভাবকদের আড্ডায় রিনা স্বামীর গল্প করতেই বেশি ভালোবাসেন। তার দৃষ্টিতে একজন দেবতার সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছে। এতো ভালো, সর্বগুণেগুণান্বিত মানুষ সচরাচর দেখা যায় না। এমন মিসেস রিনার যার কাছে জীবন মানেই স্বামী–সন্তান–সংসার এবং আনন্দ, কয়েকদিন খুব মন বিক্ষিপ্ত।

এখন রিনা বান্ধবীর বাসায় নিজের মেয়ে এবং তেরো বছরের এক কাজের মেয়েসহ। মিসেস রিনার দেবতাতুল্য স্বামীর কারণে বাসার এই না শৈশব, না কৈশোরের মধ্যবর্তী কাজের মেয়ে প্রেগনান্ট। দেবতা জিউসের নারী লোভের কথা কে না জানে! মিসেস রিনার স্বামী দেবতারও একটু পদস্খলনই ঘটেছে।

মিসেস রিনার অভিযোগের প্রেক্ষিতে স্বামী বলেছেন, এক বই মানুষ কতোবার পড়ে? রিনা নামে বই পড়া আমার শেষ।

ঘটনা দুই.

বন্ধু চিহ্ন–র বাসায় গিয়ে দেখি তার বাবা ছোট একটা মেয়েকে কোলে নিয়ে হাটছেন। চিহ্ন–র মা বার বার বলছেন, দুধের গ্লাস হাতে, মিনা, দুধ খেয়ে ঘুমাও মা। যতো দূর জানি, চিহ্নের কোনো ছোট বোন নেই। ঘটনা কি জিজ্ঞাসা করতেই যা শুনলাম তাতে পুরুষের প্রতি, মানুষের প্রতি হৃত ভালোলাগা ফিরে এলো।

মিনাকে চিহ্নদের বাসায় কাজ করার জন্য আনা হয়। কিন্তু মেয়ে এতো ছোট যে, তার পক্ষে কাজ করা তো সম্ভবই নয়, বরং তার কাজ চিহ্নদের করে দিতে হয়। চিহ্নরা তাকে নিজেদের একজন হিসেবেই বড় করে তুলছেন। মিনাকে ঘুম পাড়ানো, পড়ানো, মশারি টানিয়ে দেয়া ইত্যাকার সবই চিহ্নের বাবা–মা চিহ্ন করে চলেছে। মিনারও আশ্রয় হয়েছে, চিহ্নরাও বাসায় একজন বাচ্চা পেয়ে মেতে আছে।

দুটো ঘটনাই তো পড়লেন। আপনার কি মনে হয়, এক বই কতোবার পড়া যায়? আপনার ধর্মগ্রন্থটা আপনি কতোবার পড়েন এক জীবনে? ধর্মপত্নীকে কতোবার পড়বেন? স্খলিত দেবতা কিংবা মানবিক চেতনাসম্পন্ন সাধারণ মানুষ হওয়া আপনারই হাতে।

বেছে নিন সঠিক পথ।

মিরপুর, ঢাকা থেকে

ওয়ার্ল্ড কাপের জের

– তারিক শাম্মন

২০০২ সালের ওয়ার্ল্ড কাপে আমার প্রিয় দল হলান্ড কোয়ালিফাই করতে ব্যর্থ হওয়াতে ওয়ার্ল্ড কাপটা পানসে হয়ে যাবার উপক্রম হয়েছিল। কোন দল সাপোর্ট করা যায় ভাবছিলাম। আমার প্রেয়সী লোপা আবার আর্জেন্টিনার কড়া সাপোর্টার। এদিকে আমি আর্জেন্টিনা দেখতেই পারি না।

এবার আর্জেন্টিনা সমর্থকদের অতিরিক্ত লাফালাফি দেখে মেজাজটা কেবলি বিগড়ে যাচ্ছিল। চারদিকে আর্জেন্টিনার এতো পতাকা উড়ছিল যে, রাস্তা দিয়ে হেটে যাবার সময় মনে হতো যেন আর্জেন্টিনায় আছি। এবং লোপা তো আমাকে যেন চেনেই না। সে তখন বাতিস্তুতা, ওর্তেগা, ভেরণ বলতে অজ্ঞান। অগত্যা ব্রাজিলের দলে ভিড়ে গেলাম। আর্জেন্টিনা–ব্রাজিল তর্কে ব্রাজিলের পক্ষে সাফাই গাইতে শুরু করলাম। লোপার সঙ্গেও প্রবল তর্ক হতো। তবে বিশেষ সুবিধা করতে পারলাম না। কারণ ব্রাজিলের এবারের দল বেশি সুবিধার নয়। আর্জেন্টিনা বেশ কড়া।

যাক, প্রথম ম্যাচে আর্জেন্টিনা এক গোলে নাইজেরিয়াকে হারালো। বড় হতাশ হলাম। আর্জেন্টিনার দ্রুতলয়ে খেলা দেখে আতংকিত হলাম। আর্জেন্টিনার সমর্থকদের গলা আরো চড়া হলো। সেকেন্ড ম্যাচ ইংল্যান্ডের সঙ্গে। বেকহামের ওপর ভরসা রাখলাম। আর্জেন্টিনা পরাজিত। আমার খুশি আর ধরে না। লোপাকে কল করলাম। মোবাইল বন্ধ।

পরদিন দেখা হতেই ক্ষেপালাম। থার্ড ম্যাচ। আর্জেন্টিনার জীবন–মরণ ম্যাচ। সুইডেনের সঙ্গে জিততেই হবে। কিন্তু না, সুইডেনের সঙ্গে ড্র করে আর্জেন্টিনা বিদায় নিল। পুরো শহর যেন শোকের শহরে পরিণত হলো। তবে সবচেয়ে বেশি আনন্দিত হলো ব্রাজিলের সমর্থকরা। কয়েক জায়গায় তারা মিছিলও করলো। আমিও সেখানে যোগ দিলাম। তিন চার দিন পর লোপাকে বললাম, *হই হই রই রই, আর্জেন্টিনা গেল কই?*

সেদিন লোপাকে এতো বেশি ক্ষেপালাম যে, রাগে–দুঃখে তার চোখে পানি এসে গিয়েছিল। সে রাগ করে বললো, তোমার সঙ্গে আর কোনোদিন কথা বলবো না। যেদিন ব্রাজিল হারবে সেদিন তোমার সঙ্গে কথা বলবো। না হলে আর কখনো বলবো না।

এদিকে ব্রাজিল সেমিফাইনালে উঠে গেল। আমার মন খুব খারাপ। আমার সঙ্গে লোপা কথা বলে না। দেখা হলে এড়িয়ে যায়। সেমিফাইনালে যদিও বাইরে আমি *ব্রাজিল ব্রাজিল* বলে চেচাতে লাগলাম, ভেতরে ভেতরে টার্কি–কে সাপোর্ট করছিলাম। মনে–প্রাণে চাচ্ছিলাম ব্রাজিল হারুক। কারণ ব্রাজিল চ্যাম্পিয়ন হলে আমার বিরাট লস হয়ে যাবে। অবশেষে জার্মানিকে হারিয়ে ব্রাজিল চ্যাম্পিয়ন হলো। চারদিকে আনন্দ, উৎসব মিছিল। মন খারাপ করে বসে আছি।

আজও লোপা আমার সঙ্গে কথা বলে না। আমি অভিমান ভাঙালে হয়তো বলতো। আগেও অনেকবার এ রকম হয়েছে। কিন্তু এবার আমি ভাঙাইনি। কারণ খেলা নিয়ে কেউ এ রকম অভিমান করতে পারে এটা আমার কল্পনায় ছিল না। তাই এবার আমি অভিমান করেছি। দেখি লোপা ভাঙায় কি না।

চট্টগ্রাম থেকে

এক গোছা ডেইজি

– অনিকেত

প্রচণ্ড মাথা ব্যথায় টিকতে না পেরে জেনারেল ম্যানেজারকে সব দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে স্টোর থেকে হাসান বেরিয়ে পড়ে। কিছুদিন আগে হলে এটা সম্ভব হতো না। হাসান পুরো ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের ম্যানেজার ইনচার্জ। তার অনেক দায়িত্ব। কিন্তু টুইন টাওয়ার ট্র্যাজেডির পর থেকে আমেরিকার অর্থনীতি কিছুটা নিম্নমুখী। তাই স্টোরে এখন মন্দাভাব চলছে। স্টোর থেকে বেরিয়ে

ফুটপাথে অগনিত মানুষের ধাক্কা সামলে সে থার্টি ফোর্থ স্ট্রিট পেন স্টেশনে কুইন্সগামী এফ ট্রেন ট্র্যাকের সামনে গিয়ে দাড়ায়।

এটা রাশ আওয়ার। ট্রেন যে কোনো সময় এসে পড়বে। হাসান বেঞ্চিতে বসে কপাল আর চুলে হাত বোলায়। সে বুঝতে পারে মাথা ব্যথা নিয়ে বেশি ভাবলে ব্যথা আরো বেশি অনুভব হবে। সে মনোযোগ অন্যদিকে দেয়ার চেষ্টা করে। আশপাশে ফিরে দেখে, একজন মেক্সিকান গিটারিস্ট স্প্যানিশ গিটার বাজিয়ে ভিক্ষা করছে। ঢোলা প্যান্ট আর টি–শার্ট পরা কয়েকজন কৃষ্ণাঙ্গ যুবক ওয়াকম্যান কানে দিয়ে র‍্যাপ সঙ্গীতের তালে তালে নাচছে। একজন কোট, টাই পরা শ্বেতাঙ্গ ভদ্রলোক গভীর মনোযোগ দিয়ে দাড়িয়ে সিগার (উধথটর) ম্যাগাজিন পড়ছে। শপিং ব্যাগ হাতে কয়েকজন শ্বেতাঙ্গ তরুণী চুয়িংগাম চিবাচ্ছে। পেপার কফি কাপ হাতে একজন কৃষ্ণাঙ্গ ভিখারী সবার সামনে গিয়ে দাড়াচ্ছে এবং ভিক্ষা পাবার আশায় কফি কাপ তুলে ধরে বলছে, স্পেয়ার সাম চেঞ্জ – দুটো পয়সা ভিক্ষা দাও।

ভিখারীটি যার সামনেই যাচ্ছে সেই তাকে না দেখার ভান করে মুখ ঘুরিয়ে অন্যদিকে তাকাচ্ছে। সে প্রতিবারই বিরক্ত হয়ে *চিপ শিট* বলে গালি দিয়ে এগিয়ে অন্যজনের সামনে গিয়ে দাড়াচ্ছে।

আরো কতো রকমের মানুষ হাসানের মতো ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করছে আর নিজ নিজ স্বভাব অনুযায়ী পরিস্থিতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে বিভিন্ন রকম আচরণ করছে।

অন্ধকার সুড়ঙ্গ থেকে ট্রেন হুইসলের শব্দ ভেসে আসে। যারা ট্রেন ট্র্যাক–এর একেবারে কাছে দাড়িয়েছিল তারা কয়েক পা পেছনে সরে আসে। এটা সাবওয়ে কর্তৃপক্ষের সাবধান বাণী। ট্রেনের হুইসল শোনা মাত্র ট্র্যাক থেকে দূরে সরে দাড়াও। যারা বেঞ্চিতে বসেছিল তারা উঠে দাড়ায় এবং কয়েক পা সামনে এগিয়ে আসে। হাসানও উঠে দাড়ায়। ট্রেনটা ধীরগতিতে এসে থামে। অটোমেটিক দরজা খুলে যায়। একদল যাত্রী বেরিয়ে আসে আর অপেক্ষারত যাত্রীরা ভেতরে ঢোকে। হাসান এককোণে গিয়ে বসে পড়ে। ট্রেন চলতে শুরু করে। হাসান আবার মনোযোগ অন্যদিকে দেয়ার চেষ্টা করে। এদিক ওদিক তাকায়। কেউ বই পড়ছে, কেউ পেপার, কেউ পত্রিকা, কেউ বা দাড়িয়ে দাড়িয়ে চুয়িংগাম চিবাচ্ছে, কেউ ওয়াকম্যান কানে দিয়ে গান শুনছে, কেউ বসে বসে আপন মনে ভাবছে, নিজস্ব ভুবনে বিচরণ করছে। এক কোণে একজন ইনডিয়ান স্কুল পড়ুয়া ছাত্রী তার কৃষ্ণাঙ্গ সতীর্থের পাশে বসে তাকে চুমু খাচ্ছে। কৃষ্ণাঙ্গটি চুমু খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বার বার মেয়েটির বুকে হাত দিচ্ছে। মেয়েটি প্রতিবারই হাত সরিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু চুমু খেতে সে আপত্তি করছে না। সে গভীর আবেগে কৃষ্ণাঙ্গটির নিঃশ্বাসের উষ্ণতা এবং ঠোঁট ও জিভের লবণাক্ত স্বাদ উপভোগ করছে।

হাসানের পাশে বসে আছে এক পাঞ্জাবি পৌঢ় ভদ্রলোক। সে আড়চোখে বার বার তাদের দিকে তাকাচ্ছে আর কিছুটা লজ্জা, কিছুটা রাগে মাথা নিচু করে ফেলছে। দেশি ছেলেমেয়েদের এই চারিত্রিক অবনতি সে মেনে নিতে পারছে না। ব্যাপারটা হাসানের কাছেও দৃষ্টিকটু লাগে। সাবওয়ে প্ল্যাটফর্ম, ট্রেনের ভেতর এবং রাস্তার মোড়ে প্রায়ই এ রকম দেখা যায়। বাঙালি, ইনডিয়ান, পাকিস্তানি ছেলেমেয়েরা ভিন্ন বর্ণ এবং সংস্কৃতির ছেলেমেয়েদের সঙ্গে অবাধে মেলামেশা করছে। ব্যক্তি হিসেবে হাসান মোটেই কুসংস্কারাচ্ছন্ন বা রক্ষণশীল না। কিন্তু সংস্কৃতির এই সংমিশ্রণ সে মানতে নারাজ। তার মতে, একজন মানুষের শারীরিক চাহিদা এবং মনের আবেগ বা অনুভূতি কখনো তার সংস্কৃতির ঊর্ধে হতে পারে না। হাসান মনে করে, আমরা যদি

এভাবে অবাধে মেলামেশা করতে থাকি তাহলে আমাদের এতো বছরের পুরনো সংস্কৃতির স্বকীয়তা এবং ঐতিহ্য অচিরেই ধ্বসে পড়বে। তখন আমরা নিজেদের কি বলে পরিচয় দেবো? শংকর সংস্কৃতির মানুষ হিসেবে?

কুইন্সের জ্যাকসন হাইট স্টেশনে এফ ট্রেন এসে থামে। অন্য যাত্রীদের সঙ্গে হাসান ট্রেন থেকে নেমে সিড়ি দিয়ে উপরে উঠে যায়। তারপর টিকেট কাউন্টারের পাশে ফুলের দোকান থেকে এক গোছা ডেইজি ফুল কেনে। হাসানের স্ত্রী শ্রুতির প্রিয় ফুল ডেইজি।

বেশ কয়েক বছর আগে টেলিফোনের মাধ্যমে তাদের বিয়ে হয়। প্রায় বছর খানেক আগে শ্রুতিকে এখানে হাসান নিয়ে আসে। আমেরিকায় আসার পর প্রথম যে জিনিসটা শ্রুতি পছন্দ করে সেটা হলো ডেইজি ফুল। হাসান কারণে অকারণে অনেক দিন ফেরার পথে ডেইজি কিনেছে, বিশেষ করে শ্রুতি যখন রাগ বা অভিমান করেছে। শ্রুতি প্রায়ই অভিযোগ করে, হাসান সারাদিন কাজে ব্যস্ত থাকে। তাকে ঘরে একা থাকতে হয়। গ্রোসারি, রান্না আর লনড্‌রি – প্রতিদিন একই রুটিন। এই প্রবাস জীবনে কোনো বৈচিত্র নেই।

হাসান তাকে বহুবার বুঝিয়েছে, আমরা সারা জীবন এই পরবাসে থাকবো না। আর মাত্র কয়েকটা বছর। আমি এতোদিন চাকরি করে বেশ কিছু টাকা জমিয়েছি। আরো কিছু জমলে আমরা দেশে ফিরে যাবো। সেখানে বিরাট একটা ডিপার্টমেন্টাল স্টোর দেবো। আমাদের সন্তানের জন্ম হবে দেশের মাটিতে। সে আমাদের সংস্কৃতির ছত্রছাত্রায় বেড়ে উঠবে। এটা আমার স্বপ্ন – ওমবণঢটহ মলর্দধয ষধফফ টররধশণ টভঢ র্ধ ষধফফ ´টপণ ল্র ´ম ´দণ ফটভঢ ষণ ঠণফমভথ.

শ্রুতি কিছু বলেনি। শুধু চাপা একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে।

হাসান তার অ্যাপার্টমেন্টের দরজা খুলে ভেতরে ঢোকে। তারপর দরজা বন্ধ করে বসার ঘরে যায়। শ্রুতি সেখানে নেই। কিচেন থেকেও কোনো শব্দ আসছে না। শ্রুতি নিশ্চয়ই গ্রোসারি কিনতে বাইরে গেছে। হাসান তার হাতে ধরা ডেইজি ফুলগুলোর দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসে। শ্রুতি বেডরুমের বিছানার পাশের টেবিলে একটা ফুলদানি সাজিয়ে রেখেছে। সেটাতে ডেইজি শোভা পাক আর না পাক, শ্রুতি প্রতিদিন পানি বদলে রাখে। হাসান ডেইজি নিয়ে ফিরলেই শ্রুতি দৌড়ে এসে তার হাত থেকে ডেইজিগুলো কেড়ে নিয়ে সেই ফুলদানিতে রাখে। আজ সময়ের আগে ফিরে আসায় সেই কাজটা তাকেই করতে হবে। প্রচণ্ড মাথা ব্যথা সত্ত্বেও হাসান আপন মনে হাসতে হাসতে বেডরুমের দিকে এগিয়ে যায়। শ্রুতি আজ ঘরে ফিরে ভীষণ অবাক হবে। প্রথমত, হাসান সময়ের আগে ঘরে ফিরেছে যা আগে কখনো ঘটেনি। দ্বিতীয়ত. ফুলদানিতে ডেইজি।

বেডরুমের দরজা খুলে হাসান ভেতরে পা রাখতেই থমকে দাড়ায়। সে একেবারে স্তব্ধ হয়ে যায়। শ্রুতি বিছানায় শুয়ে অঘোরে ঘুমাচ্ছে। পাশে একজন শ্বেতাঙ্গ যুবক। দুজনেই নগ্ন।

এমনিতেই মাথা ব্যথার কারণে হাসান সারাদিন অসুস্থ বোধ করছিল।

তারপর এই ঘটনার আকস্মিতায় তার শরীর একেবারে অসাড় হয়ে যায়।

হাতে ধরা ডেইজিগুলো মাটিতে লুটিয়ে পড়ে।

নিউ ইয়র্ক থেকে

ভুল বোঝাবুঝি

– মেহমুদ হাসান মুরাদ

আপনারা নিশ্চয়ই বডি ল্যাংগুয়েজের সঙ্গে পরিচিত। যেমন ধরুন, আমরা প্রায়ই হাত নেড়ে কাউকে কাছে ডাকি। মাথা এদিক–ওদিক নাড়িয়ে অপারগতা প্রকাশ করি। ওপর নিচ করে সম্মতি জানাই।

আমি একটি আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন এসসিআই–এর সঙ্গে বেশ কয়েক বছর যাবৎ জড়িত। এ সংগঠনেরই কয়েকটি কার্যক্রমে অংশগ্রহণের জন্য ১৯৯০ সালে ভারতে যাই। বেশ কিছু কার্যক্রমের মাঝে একটি ছিল তামিলনাড়ুর আলমপুন্ডি নামে একটি গণ্ডগ্রামের গান্ধী করাল রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার (জিআরআরসি) নামে একটি সংগঠনের বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করা। আলমপুন্ডি হচ্ছে ব্যাঙ্গালোর, মাদ্রাজ ও পুন্ডেচেরির মধ্যবর্তী একটি গ্রাম। সঠিক দূরত্ব মনে নেই। তবে ব্যাঙ্গালোর থেকে সাত আট ঘণ্টার পর এবং আলমপুন্ডি থেকে পুন্ডেচেরি তিন চার ঘণ্টার পথ বাসে। ব্যাঙ্গালোর থেকে আলমপুন্ডি যেতে হলে প্রথমে বাসে পাচ ছয় ঘণ্টায় আসতে হয় তিরুভান্নামলাই এবং সেখান থেকে মাদ্রাজ কিংবা পুন্ডেচেরির দিকের বাসে ঘণ্টা দুই আড়াই–এর পথ।

যাই হোক আমি আলমপুন্ডি গিয়েছিলাম ব্যাঙ্গালোর থেকে। ব্যাঙ্গালোর থেকে রাত সাড়ে নয়টায় বাসে করে তিরুভান্নামলাই এসে পৌছায় রাত তিনটায়। তারপর বাকি রাতটুকু বাসস্ট্যান্ডের সিটারের ওপর স্লিপিং ব্যাগে ঢুকে লাগেজ জড়িয়ে ধরে শুয়ে থেকেই কাটিয়ে দিই। খুব ভোরে নাশতা সেরে ছয়টার দিকে আলমপুন্ডির বাসে চড়ি। তিরুভান্নামলাই থেকে আলমপুন্ডি যেতে বিভিন্ন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিলাম এবং বেশ কিছু অভিজ্ঞতাও হয়েছিল। তার মধ্যে দুটো ঘটনা এখনো আমার খুব মনে আছে। এই ঘটনাগুলো মাঝে মধ্যে মনে হয় হাসির, মাঝে মধ্যে লজ্জার। আমি বুঝে উঠতে পারি না।

একে তো অপরিচিত ভাষা, তারপর নতুন জায়গা। আতংকে ছিলাম। তিরুভান্নামালাই থেকে প্রথমে একটি বিপরীতগামী বাসে উঠে পড়েছিলাম। ফলে একটি অনিশ্চয়তায় ছিলাম, এবার ঠিক বাসে চড়েছি কি না। বাসের মোটামুটি সকলেই ছিল গ্রাম্য লোকজন। ফলস্বরূপ তাদের সঙ্গে কোনো কার্যকরী যোগাযোগ করতে পারছিলাম না। হিন্দি যদিও খুব অল্প বুঝি তবুও বলা একেবারেই অসম্ভব। তাছাড়া ওই এলাকার লোকজন হিন্দিই ভালোভাবে জানে না শিক্ষিত ছাড়া। তাদের সকল যোগাযোগই তামিল ভাষায়।

বাস ছাড়ার পর এ রকম লোক খুজছিলাম যাদেরকে ছাত্র কিংবা শিক্ষিত মনে হয়। এমন সময় একজন প্যান্ট শার্ট পরা যুবককে দেখলাম বাসে চড়লো। তার হাতে বই–খাতা ছিল। এবার মনে স্বস্তি অনুভব হতে লাগলো এই ভেবে যে, হয়তো ওই যুবক আমাকে আলমপুন্ডি সম্পর্কে ধারণা দিতে পারবে, তার কাছ থেকে সাহায্য পাবো। বাসটা খালিই ছিল। লাগেজসহ ওই যুবকের পাশে বসে তাকে ইংরেজিতে অনুরোধ করলাম যেন আলমপুন্ডি এলে আমাকে জানায়।

সে একটি স্মিত হাসি দিয়ে এদিক–ওদিক মাথা দোলালো, কোনো কথা বললো না।

খুবই বিস্মিত হলাম এ ধরনের ব্যবহারে। তারপরও কিছুই করার নেই দেখে আবার তাকে জিজ্ঞাসা করলাম যে, সে কি আলমপুন্ডি পর্যন্ত যাচ্ছে?

এবারও সে রোবটের মতো হাসি নিয়ে এদিক–ওদিক মাথা দোলালো। আমার তো তখন চান্দি হট। ইচ্ছা হচ্ছিল তাকে কিছু বাংলা ব্যাকরণ শিখিয়ে দিই। কিন্তু *হাতি–ফাদ–চামচিকা।* কিছুক্ষণ পর আবার যেচে পড়েই বললাম, সে কি কষ্ট করে আমাকে আলমপুন্ডি কখন পৌছাবে তার কোনো ধারণা দিতে পারে কি না?

আবারও ঠিক আগের মতোই হেসে মাথা এদিক–ওদিক কোনো কথা নেই।

এবার তো রীতি মতো তাকে মনে মনে অনেক বিশেষণে ডেকে তার পাশ থেকে উঠে গিয়ে দরজার পাশের সিটটাতে বসলাম। ভাবছিলাম মানুষ এতো অভদ্র হয় কি করে! কি সুন্দর হেসে হেসে আমাকে শুধু না বলে যাচ্ছে। একটি ছোটখাটো ঝগড়ার জন্য নিশপিশ করছিলাম আর রাস্তার দিকে লক্ষ্য রাখছিলাম। দেখলাম প্রতিটি স্টপেজের আগে এবং পরে স্টপেজের নাম লেখা বড় বড় নেমপ্লেট আছে। মনে মনে আশ্বস্ত হলাম আলমপুন্ডি এলে চোখে পড়বে যদি ইতিমধ্যেই আলমপুন্ডি পার না হয়ে থাকি। এ বাস যে আলমপুন্ডি যাচ্ছে নিশ্চিত হয়েছি যখন হেলপারকে আলমপুন্ডি বলে ভাড়া দিয়েছি। তাই উৎকণ্ঠা নিয়ে বসে আছি।

এক সময় আলমপুন্ডি নেমপ্লেট চোখে পড়লো। লাগেজসহ ওঠার প্রস্তুতি নিচ্ছি এমন সময় সেই যুবকটি এসে আমাকে শুধু বললো, আলমপুন্ডি।

আমি বাস থেকে নামার সময় তাকে একটি অবজ্ঞাসূচক রুক্ষ ধন্যবাদ জানাই। মেজাজটা তখন আরো সপ্তমে চড়ে গিয়েছিল। সারাটা পথ সে আমাকে টেনশনে রেখে এখন ভদ্রতা দেখাতে এসেছে। বলে কি না আলমপুন্ডি। ব্যাটা আমিও তো দেখেছি আলমপুন্ডি। মেজাজটা অসম্ভব খারাপ হয়ে গিয়েছিল।

আমি যে সংগঠনের কাজে গিয়েছিলাম ওই সংগঠনের পরিচালক তখন আলমপুন্ডির বাইরে ছিলেন। আসবেন দুদিন পর। তবুও আমার খাওয়া–দাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল ওনার বাসাতেই। ওনার মা–বাবা, ভাই–বোনদের সঙ্গেই খাবার খেতাম। এ প্রেক্ষিতে ওনার ছোট ভাই শিবাজি এবং শিবাজির কয়েকজন বন্ধুদের সঙ্গে পরিচয় ঘটে। শিবাজি এবং তার বন্ধুদের সঙ্গে সীমিত গল্প করা যেতো। বেশির ভাগ সময় আমিই কথা বলতাম। তারা মাঝে মধ্যে কিছু প্রশ্ন করতো।

যেদিন পৌছালাম তার পরদিন বিকেলে বাজারে চা খেতে গিয়েছি। চা স্টলে আমার নতুন বন্ধুরাও আড্ডা দিচ্ছিল। তাদের সঙ্গে কুশল বিনিময়ের পর তাদেরকে চা খাওয়ানোর ইচ্ছা প্রকাশ করলাম। তারা উভয়েই হেসে মাথা এদিক–ওদিক করলো। না করছে দেখে তাদেরকে আবার অফার করি। এবারও তারা হেসে মাথা এদিক–ওদিক করলো। মনে মনে ভাবলাম, যাক বাবা, বাচা গেল। কি দরকার এ বিদেশ–বিভূই–এ গাটের পয়সা খরচ করার (পাঠকবৃন্দ আমাকে কোনোভাবেই কৃপণ ভাববেন না যেন)। তাই আমি *আর একবার সাধিলেই খাইবো* থিওরির ব্যবহার না করে এক কাপ চা–এর কথা দোকানিকে বলি। তাদের সামনে খুব আশা করেই চা শেষ করি। এটা নিশ্চয়ই কোনো অভদ্রতা করিনি আমি, কি বলেন?

পরদিন পরিচালক মি. কে কুমার আসেন। ওনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে এটা–ওটা নিয়ে কথা চালিয়ে যাচ্ছি। আমাদের সংগঠন এবং ওনাদের সংগঠনের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলাপ আলোচনা করছি। লক্ষ্য করলাম, যখন কথা বলছি, তিনি স্মিত হেসে মাথা এদিক–ওদিক দোলাচ্ছেন। খুবই অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম। আপনারাই বলুন, যার সঙ্গে কথা বলছেন, সে যদি নেগেটিভ অ্যাটিচুড দেখায়, এদিক ওদিক মাথা দোলাতে থাকে, তার সঙ্গে কি আলাপ–আলোচনা এগোতে পারে?

আমি কথা থামিয়ে বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কি আমার কথা পছন্দ করছেন না?
কেন? তুমি তো খুব ইন্টারেস্টিং আলোচনা করছো। তোমার কথা বেশ ভালো লাগছে। চালিয়ে যাও।
তাহলে সব সময় এ রকমভাবে না করে যাচ্ছেন কেন? নেগেটিভ অ্যাটিচুড দেখাচ্ছেন কেন?
কে কুমার তো বিস্ময়ে থ।
আমি নেগেটিভ অ্যাটিচুড দেখাচ্ছি! তোমাকে না বলছি! এসব কি বলছো? নিশ্চয়ই কোথাও গোলমাল আছে। কে কুমার বললেন।
আমি আপনার বডি ল্যাংগুয়েজের কথা বলছি।
ঘদর্ট্; ষরমভথ ষর্ধদ বহ ঠমঢহ ফটভথলটথণ? আমার বডি ল্যাংগুয়েজে কি গোলমাল হয়েছে?
আপনি শুধু মাথা এদিক-ওদিক নাড়াচ্ছেন। তার মানে নিশ্চয়ই আপনি আমার কথাগুলো পছন্দ করছেন না, গুরুত্বই দিতেই চাচ্ছেন না আমার কথার।
কুমার বুদ্ধিমান লোক। তিনি ব্যাপারটা ধরতে পারলেন। তারপর তার সঙ্গে আলাপ করে যা জানতে পারলাম তা শুনে আমার খুব লজ্জা হতে লাগলো। নিজের অপরাধ বোধ হতে লাগলো।
প্রকৃত ব্যাপারটি হলো, ওই এলাকার লোকজন কারো কথা খুব মনোযোগ দিয়ে শুনছে, সম্মতি জানাচ্ছে ইত্যাদি বোঝাতে মাথা এদিক-ওদিক দোলায়, আমরা যেমন না বোধক বোঝাতে এদিক-ওদিক মাথা নাড়াই। আসল কথা হলো, আমরা মাথা নাড়িয়ে যেভাবে না বোঝাই তারা একইভাবে হ্যা বোঝায়।
এখন ব্যাপারটা একটু চিন্তা করুন। বাসে কি কাণ্ডটাই না করলাম। ওই যুবককে ভালো ভাবে ধন্যবাদ জানাইনি, রাগত চোখে তাকিয়েছি। তাছাড়া আগের দিনই নতুন বন্ধুরা চা পান করবে বলার পরও তাদেরকে না দিয়ে একা চা পান করেছি, কি লজ্জাকর ব্যাপার!
তারপর কুমার-এর কাছে আগের ঘটনাগুলো বললাম এবং এও অনুরোধ করলাম যে, সে যেন শিবাজিকে অন্তত একবার বুঝিয়ে বলে ঘটনাটা।
বিকেলে আবার শিবাজি এবং তার বন্ধুদের সঙ্গে দেখা। এবার তাদেরকে না জিজ্ঞাসা করেই চায়ের অর্ডার দিই। তাদের হাতে চা তুলে দিতে দিতে ক্ষমা চেয়ে নিই এবং ব্যাপারটা খুলে বলি। কিন্তু বাসের ওই যুবকটি যার প্রতি রাগ প্রকাশ করে ভদ্রতাবশতও তার নামটা পর্যন্ত জিজ্ঞাসা করিনি, সে কি ভাববে? সে কি কোনোদিন জানতে পারবে এটা শুধুই একটা ভুল বোঝাবুঝি?

ঢাকা থেকে

গান বিপত্তি

– থৃ জিরো

দশ বছর এ দেশে বসবাস করছি। কম্পানির নিয়ম হলো, রমজান মাস থেকে হজ পর্যন্ত কোনো ছুটি নেই। তাই এই দশ বছরে বিশটি ঈদ করতে হলো এ দেশে আত্মীয়স্বজন ছাড়া শুধু বিদেশি বন্ধুদের নিয়ে।
ঈদ এখানে বাংলাদেশের মতো নয়। ঈদের আগের রাত কেউ ঘুমায় না। শুধু ঘোরাঘুরি, আড্ডা, শপিং। আর ফজরের নামজের পর সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ঈদের নামাজ পড়া হয়। পুরুষ-মহিলা সবাই এক সঙ্গে ঈদের নামাজ পড়ে। এরপর সারাদিন ঘুম। দিনের বেলায় ঘর থেকে বের হলে

মনে হবে বাংলাদেশের বিরোধী দলের হরতাল। আবার সারা রাত আত্মীয়স্বজনের বাসায় বেড়ানো। রাস্তায়, পার্কে আড্ডা।

আমরাও এর ব্যতিক্রম ছিলাম না। একেকটা ঈদ একেক শহরে। যদিও এসব শহরের দূরত্ব পাচশ থেকে দুই হাজার কিলোমিটার। নিজস্ব গাড়ি অথবা ভাড়া করা লেটেস্ট মডেলের গাড়ি নিয়ে বিভিন্ন শহরের অলিগলি পার্কে ঘুরে বেড়ানো যেন এটাই ঈদ। তবে ঈদের সময় গাড়ি ভাড়ার জন্য কমপক্ষে এক মাস আগে বুকিং দিতে হবে। না হয় গাড়ি পাওয়ার কোনো আশা নেই। মোটামুটি এটাই হলো এখানকার ঈদ। গত বিশটি ঈদে এসব শহর ভ্রমণের সঙ্গে সঙ্গে বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয়েছে। তবে এ মুহূর্তে সবচেয়ে বেশি মনে পড়ছে গত ঈদের ঘটনা।

সন্ধ্যার কিছুক্ষণ আগে এক মার্কেটের সামনে দিয়ে একা একা হেটে যাচ্ছি। উদ্দেশ্য এক বন্ধুর বাসা। সেখান থেকে সবাই মিলে সমুদ্র সৈকত *ইয়ানবো* শহরে যাবো। মনের অজান্তে কখন থেকে গুণ গুণ করে এখানকার একটি জনপ্রিয় আরবি গান গেয়ে যাচ্ছি – *নাহানা ছালাছা বিনত হেলুইন* – আমরা তিন সুন্দরী মেয়ে।

আমাদের দেখে গান গাওয়া হচ্ছে।

মেয়েলি কণ্ঠের আওয়াজ শুনে পাশে ফিরে দেখি তিন অ্যারাবিয়ান মেয়ে। মাথা থেকে পা পর্যন্ত কালো বোরকা। একজনের মুখ খোলা, বাকি দুইজনের শুধু চোখ দুটো দেখা যাচ্ছে। মুখ খোলা মেয়েটি অনেকটা ঐশ্বরিয়াকেও হার মানাবে। আর আমার মনে হলো পায়ের নিচ থেকে মাটি সরে যাচ্ছে। এই রক্ষণশীল সমাজে মেয়েদের উদ্দেশ্যে গান গাওয়া মানে সর্বোচ্চ অপরাধ। নির্ঘাত যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। তাও আবার এ দেশেরই মেয়ে।

কি ব্যাপার! এ গান আমাদের তিনজনকে শোনানো হচ্ছে, মুখ খোলা মেয়েটির রাগান্বিত কণ্ঠস্বর। মনে হলো বদমেজাজি। বাকি দুইজন মিটি মিটি হাসছে।

না, তোমাদের উদ্দেশ্যে নয়। আসলে আমি তোমাদেরকে দেখিনি। আনমনেই গান গেয়ে যাচ্ছিলাম।

তাহলে কি আলো বাতাসকে তিন মেয়ের গান শোনালে। দাড়াও, দেখাচ্ছি মজা। বলেই রাস্তায় টহলরত পুলিশের গাড়িকে ইশারা করতেই পুলিশ সামনে এসে হাজির।

তাদের কথা তারা বললো এবং আমার কথা আমি। যদিও সত্য তবুও আমার কথা আমারই বিশ্বাস হচ্ছে না, পুলিশ কি বিশ্বাস করবে। অগত্য আইন অনুসারে বাদী–বিবাদী সবাইকে নিয়ে থানায় রওনা হলো পুলিশ।

গাড়ির লুকিং গ্লাস দিয়ে দেখি পেছনের সিটে বসা তিন আরব্য সুন্দরী আমার অবস্থা দেখে হাসছে। আর আমি কিভাবে এই মুসিবত থেকে মুক্তি পাই তাই ভাবছি। হঠাৎ মনে হলো এক পুলিশ বন্ধুর কথা যার সঙ্গে সাত আট বছরের পরিচয়। আমি অনেকটা তার পারিবারিক বন্ধুর মতো। তার পরিবারের সবাই আমাকে চেনে।

পকেট থেকে মোবাইলটা বের করে গাড়ি চালক পুলিশকে অনুরোধ করলাম, আমি কি একটা ফোন করতে পারি? তার সোজা উত্তর, না। দ্বিতীয়বার অনুরোধেও না–সূচক জবাব। এবার পুলিশ বন্ধুর নাম বলতেই সে যেন কিছুটা ভীতু হয়ে গেল।

তার সঙ্গে তোমার কি পরিচয়?

সে আমার বন্ধু। সাত আট বছরের পরিচয়।

ঠিক আছে, ফোন করতে পারো।

আমার পুলিশ বন্ধুটি হলো এখানকার উপপুলিশ কমিশনার। ফোনে তাকে বিস্তারিত বলার পর সে ড্রাইভার পুলিশটাকে ফোনে কি বললো জানি না। তবে আমাকে বললো, যেখানে নিয়ে যায় সেখানে যাও। কোনো অসুবিধা হবে না, আমি আসছি।

প্রায় পনেরো মিনিট পর নিকটবর্তী থানায় পৌছালাম। গিয়ে দেখি ডিউটিরত অফিসার এবং আমার পুলিশ বন্ধু দুজনেই বসে আছে।

প্রথমে শুরু হলো মেয়েদের বক্তব্য। তাদের বলা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার বন্ধুটি বললো, এক মিনিট, সে যদি তোমাদেরকে উদ্দেশ্যে করে এ গান গেয়ে থাকে তাহলে তাকে ধন্যবাদ দেয়া উচিত। কারণ তার উন্নতি হয়েছে।

আমি তো একেবারেই অবাক, সঙ্গে কর্তব্যরত অফিসারটিও। বলে কি, এতো বড় অপরাধ তার উপর ধন্যবাদ। আবার সে বন্ধু বলতে শুরু করলো, ওকে আমি সাত আট বছর থেকে জানি। সে আমার ছোট ভাইয়ের মতো। নয় বছর পর সে দেশে গিয়েছিল বিয়ে করার জন্য। বিয়ে না করেই ফিরে এসেছে। মেয়েদের প্রতি তার কোনো দুর্বলতা নেই। সুতরাং মা জননীরা সে তোমাদেরকে এ গান শোনায়নি। আর যদি গান গেয়েই থাকে তবে তা আনমনে। তোমাদের উদ্দেশ্যে নয়।

কর্তার ইচ্ছায় কীর্তন। ডিউটি অফিসার আর কি করবে, তার বসই যখন আমার পক্ষে। কোনো প্রকার ঝামেলা ছাড়াই চা পর্ব শেষ করে থানা থেকে বিদায় নিলাম। সেই বদমেজাজি অথচ সুন্দরী মেয়েটি কেন জানি না, যাবার আগে একটি চমৎকার হাসি উপহার দিল।

এখনো মাঝে মধ্যে সেই মেয়েটির সঙ্গে রাস্তার মার্কেটে অথবা আমারই শোরুমে দেখা হয়। আর তখনই সেই মেয়ে আমাকেই উদ্দেশ্য করে গুন গুন করে গেয়ে শোনায় *আনা বিনত হেলুইন* – আমি সুন্দরী মেয়ে। আমি শুধু তার দিকে চেয়ে থাকি। কোনো উত্তর দিতে পারি না। জানি না কেন? কার জন্য?

সউদি আরব থেকে